হোমিওপ্যাথি

বনাম

বিজ্ঞান

উৎস মানুষ সংকলন

হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান

হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান

কিছু বিতর্ক
কিছু সিদ্ধান্ত

উৎস মানুষ

Homeopathy banam Bijnan
by
Utsa Manush

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮৪

প্রথম উৎস মানুষ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

দ্বিতীয় উৎস মানুষ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩

প্রকাশক : বরুণ ভট্টাচার্য, উৎস মানুষ, বি ডি ৪৯৪

সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪

মুদ্রণ : শৈলী, ৪এ মানিকতলা মেইন রোড

কলকাতা-৭০০ ০৫৪

প্রচ্ছদ : প্রভাস আদক

সম্পাদনা : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম : ৩০ টাকা

ISBN 81-86371-24-9

উৎস মানুষ প্রকাশিত অন্যান্য বই

বজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান / ১ম খণ্ড

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান /২য় খণ্ড

অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে

প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়

প্রতিরোধ

ছেচল্লিশের দাঙ্গা

শেকলভাঙা সংস্কৃতি

এটা কী ওটা কেন

স্বাস্থ্যের বৃত্ত

যে গল্পের শেষ নেই

প্রমিথিউসের পথে

বিবেকানন্দ অন্য চোখে

বিবেকানন্দ অন্য চোখে : একটি সমীক্ষা - আরো কিছু বিতর্ক

সাপ নিয়ে কিংবদন্তী

বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ

চলতে ফিরতে

তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক

খাবার নিয়ে ভাবার আছে

জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?

প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ

সূচীপত্র

হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত ... ১৩

বিতর্ক মঞ্চ : হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত (প্রথম পর্যায়) ... ১৮

প্রতিবাদের উত্তর ও হোমিও প্রসঙ্গে আরো কিছু ... ২৫

বিতর্ক মঞ্চ : হোমিওপ্যাথি (দ্বিতীয় পর্যায়) ... ৩৫

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু (ক্যানসারের ওষুধ) ... ৫১

একটি বিতর্কিত (অ-) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ... ৬২

হোমিওপ্যাথির পরীক্ষামূলক ভিত্তি : একটি সাম্প্রতিক বিতর্ক ... ৬৫

বিতর্ক : একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ... ৭৬

নব সংস্করণ প্রসঙ্গে

হোমিওপ্যাথিতে কি অসুখ সারে? নিশ্চই সারে। না হলে এত মানুষ হোমিও-চিকিৎসা করান কেন! ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথি কেন! সরকার-প্রবর্তিত হোমিওপ্যাথি কলেজ, হাসপাতাল, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র কেন!

আপাতভাবে যুক্তিপূর্ণ শোনালেও কথায় ফাঁক আছে। কোন অসুখ কতজনের সারে? কতজনের সারে না? দুরূহ, জটিল, মারাত্মক ব্যাধি কি হোমিও চিকিৎসায় আদৌ নিরাময় হয়? সবচেয়ে বড় কথা, অসুখ সারলে কিভাবে সারে? কোন বৈজ্ঞানিক নিয়মে? এই প্রশ্নগুলির নির্ভেজাল প্রামাণ্য উত্তর বা ব্যাখ্যা না পেলে হোমিওপ্যাথির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ থেকে যাবেই। কেবল অভিজ্ঞতায় নির্ভর করলে অনেক গোলমাল এসে যাবে। শুধু 'অসুখ সারে' বললে তো জলপড়া তেলপড়া মাদুলি আংটি রেইকি ম্যাগনেটোথেরাপি-তেও অনেকেরই রোগ সারে, কষ্ট কমে শোনা যায়। 'কিভাবে' সারে তা নিয়ে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় কই? সরকারের স্বীকৃতি কোনো বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি নয়। সরকারি নীতিতে রাজনৈতিক স্বার্থজড়িত থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পরিষেবা শহরে-গঞ্জে-গ্রামে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে দেওয়ায় ব্যর্থ সরকার। সেই ব্যর্থতাকে আড়াল করতে সরকারি উদ্যোগে হোমিওপ্যাথিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, কলেজ ও চিকিৎসাকেন্দ্র চালু করা হচ্ছে রাজ্যের নানা প্রান্তে। তাতে কি হোমিওশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রমাণিত হয়?

নানা কারণেই গত দেড় দু'দশকে হোমিও চিকিৎসা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার (অ্যালোপ্যাথি) অপ্রতুলতা, সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া খরচ, ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী ওষুধের দাম, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির চরম ছন্নছাড়া দৈন্যদশা — এই সবই সাধারণ জনগণকে অপেক্ষাকৃত সুলভ হোমিও-চিকিৎসার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ এটাই।

তা বলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অহমিকায় 'বাতিল' বলে রায় দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই, কারণ এ বিদ্যা নিয়ে চর্চা, সমীক্ষা, গবেষণা থেমে নেই। প্রয়োগ, পরীক্ষা, প্রচেষ্টা চলছে দেশে-বিদেশে। যাবতীয় হোমিও-চিন্তা এখনো অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর হ্যানিম্যানে থমকে দাঁড়িয়ে আছে — একথা বলা ধৃষ্টতার পরিচয় হবে।

কাজেই বিতর্কের সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা থেকেই যাচ্ছে। যে-কোনো 'প্যাথি' বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও ভিত্তির নিরীখে ছাড়পত্র পেলে তা মানুষেরই কল্যাণ সাধন করবে। বিজ্ঞানসম্মতভাবেই তা গ্রহণযোগ্য হবে, ''বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি''কে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। .... তাই বছর দুয়েক আগে এ গ্রন্থের পূর্বতন সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার পর, নব সংস্করণ প্রকাশের দায় আমরা বোধ করছিলাম।

বর্তমান সংস্করণে দুটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। 'ক্যানসারের ওষুধ' সংক্রান্ত এক আকর্ষণীয় বিতর্ক, এবং বিতর্ক : একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে। জ্ঞানপিপাসু জিজ্ঞাসু পাঠকদের চাহিদা পূরণের সাধ্যমত চেষ্টা আমরা করেছি। এর সার্থকতা বিচার করবেন বিচক্ষণ পাঠক।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর তরফ থেকে

"হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান"-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে এটা আনন্দের কথা। 'উৎস-মানুষে'র বন্ধুদের ধন্যবাদ।

বিজ্ঞান ও হোমিওপ্যাথির মধ্যে সামঞ্জস্য বা সম্পর্ক নিরূপণে যে পরীক্ষা ও বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল গত শতাব্দীতে, তার জের এখনও চলছে - হয়তো বা আরও জোরদারই হয়েছে। সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন এই সংস্করণে যুক্ত হল।

উত্তর আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত এই সময়ে বিভিন্ন জীবনযাপন পদ্ধতির প্রতি সহনশীলতা বেড়েছে। হোমিওপ্যাথিরও নতুনত্বে উত্তরণ হয়তো সময়ের অপেক্ষা। বিজ্ঞানেও তো সীমানা ভেঙে তছনছ। কাজেই বিদ্বেষহীন বিচার চলুক।

সম্পাদকমণ্ডলী
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ফেব্রুয়ারি, ২০০৩

প্রকাশকের (উৎস মানুষ) ভূমিকায়

হোমিও-চিকিৎসা বিজ্ঞান-সমর্থিত নয়, এর কার্যকারিতা নিদান ও ওষুধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণিত নয়—এরকম স্পষ্ট সিদ্ধান্ত আধুনিক চিকিৎসক ও বিজ্ঞানকর্মীগণ যতই দর্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করুন না কেন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনগণের অন্দরমহলে কিংবা সাধারণের মনের অন্তঃস্থলে হোমিওপ্যাথি অত সহজে বর্জিত বা প্রত্যাখ্যাত হয় না। এটা বাস্তব কথা। সত্যি কথা। যে কোনো কারণেই হোক, হোমিওর ছোট্ট ছিপিগুলি যে ঘরে ঘরে সযত্নে সমাদৃত হয় এবং সে সমাদর যে দিনকে দিন বাড়ছে বই কমছে না, সেকথা সচেতন গণবিজ্ঞানসেবীরা সম্যক জানেন। জেনেও চুপ করে থাকতে হয়, না হলে বাধ্য হয়ে 'বৈজ্ঞানিক' গোঁয়ার্তুমিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হয় কারণ সাধারণ মানুষের সরল কৈফিয়ৎ হলো—ওসব বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটিত্তি বুঝি না, সোজাসাপ্‌টা বিপরীত গোঁয়ার্তুমি। তৎপর আধুনিক ডাক্তার কিংবা বিজ্ঞানকর্মী ঝটিতি যুক্তি শানাবেন—সে তো ঝাড়ফুঁক টোট্‌কা মাদুলি মন্ত্রেও কোনো কোনো অসুখ সারে! কিভাবে সারে, কতটা সারে, সারতে গিয়ে অন্য বিপদ বাড়ে কিনা, সাদা গুল্লি আর জল ওষুধে সত্যি সত্যি কী আছে, এসব প্রশ্নের মীমাংসা করবে কে? স্রেফ বিশ্বাসের ভরসায় অপরীক্ষিত অবৈজ্ঞানিক ওষুধ শরীরে চালান করা কতখানি নিরাপদ?

...যুক্তি ঠুকে তর্ক তোলা যায় কিন্তু তাতে 'বহু দূর'ত্ব ঘোচানো যায় না। একথা স্বীকার করতেই হবে অ্যালোপ্যাথি-হোমিওপ্যাথি বিতর্কে হোমিও চিকিৎসার প্রতি বহু মানুষের অন্ধ ভক্তির অর্গলটাতে চিড় ধরাতে পারেন নি বিজ্ঞানীরা, এবং এই ব্যর্থতাকে আড়াল করতে গিয়ে তাঁদের আত্মম্ভরিতা আর অবজ্ঞার মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়েছে বারবার, মানুষের মন জয় করা যায় নি।

আমরা (*উৎস মানুষ*) আগাগোড়াই ব্যাপক মানুষের বিশ্বাস আর বিভ্রমের রসায়নটাকে বুঝতে চেয়েছি, মর্যাদা দিতে চেয়েছি মানুষের দ্বান্দ্বিক চিন্তার উপকরণগুলিকে। আমরা দেখেছি মানুষের একান্ত নিজস্ব ভাব-ভাষা-ভাবনাকে তাচ্ছিল্য করে কোনো লাভ হয় না, বরং খুঁজে দেখতে হয় বনিয়াদি ধ্যান-ধারণার ফাঁকফোকরগুলোকে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই, হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞানের মুখোমুখি বিরোধিতার প্রশ্নে একটি নির্ভরযোগ্য নির্ভেজাল তাত্ত্বিক মীমাংসার অন্বেষণ আমরা করতে চেয়েছি অনেকদিন ধরেই।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় চর্চা ও সুস্থ বিতর্কের সত্যিই বড় অভাব। বাংলাদেশের *মাসিক গণস্বাস্থ্য*, কলকাতার *উৎস মানুষ* ও অন্য দু-একটি পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত গোটাকয়েক নিবন্ধকে বাদ দিলে একমাত্র *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* পত্রিকাতেই সুপরিকল্পিতভাবে হোমিও-বিতর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা'-র (SWF) উদ্যোগে বিতর্কমূলক সেমিনার হয়েছে (জুন, ১৯৮২) এবং শেষে সংগৃহীত তথ্যাদি ও মতামতকে একত্রিত করে *বি-ও-বি* প্রকাশ করেছে *হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান* নামে একটি পুস্তিকা (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪)। কিন্তু এ-সমস্ত প্রয়াসই এক দশকেরও আগেকার ঘটনা। মাঝে দশ-বারো বছরে দেশে-বিদেশে হোমিওপ্যাথি নিয়ে অনেক ভালোমন্দ চর্চা হয়েছে, হোমিও চিকিৎসা প্রসঙ্গে আমাদের দেশের সরকারি নীতি ও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য-পরিষেবার বিষয়টিও বিভিন্নভাবে

গুরুত্ব পেয়েছে, এবং এরই সঙ্গে *হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান* জাতীয় বই-এর চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু জোগান দেওয়া যায় নি। ১৯৮৪ সালের পর নিবন্ধ সংকলনের কাজ আর বিশেষ এগোয় নি।

অথচ এটার খুব দরকার ছিল। একটি সুসম্বন্ধ তথ্য-তত্ত্বের ভিত্তি ও সুস্থ বিতর্কের প্রেক্ষাপট নাগালের মধ্যে থাকা বড় প্রয়োজন—ব্যাপক মানুষের চেতনার স্বার্থে, বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তের স্বার্থে। তীব্র প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*-র প্রকাশনাটির পরিমার্জিত পরিবর্ধিত রূপে আত্মপ্রকাশ চাইছিলাম। অবশেষে *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর* সম্পাদনার সঙ্গে পরিপূরক ভূমিকায় *উৎস মানুষ*-এর প্রকাশনা—হাতে হাত লাগিয়ে যৌথ প্রয়াস। ফসল এই বর্তমান গ্রন্থ।

এতে খোলামনের আলোচনা-বিতর্ক-প্রশ্ন-পর্যালোচনা রয়েছে, আর রয়েছে উন্নততর গবেষণার মধ্যে দিয়ে গ্রহণযোগ্য যুক্তি-তথ্য-তত্ত্বের হাতিয়ার রচিত হওয়ার প্রতীক্ষা।

পরিচালকমণ্ডলী

উৎস মানুষ
১৯৯৬

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর তরফ থেকে

পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর বিগত কয়েক বছর ধরেই বন্ধু-শুভানুধ্যায়ী এবং উৎসাহীরা অনুরোধ করে আসছিলেন নতুন সংস্করণ প্রকাশের জন্য কিন্তু কাজটা হয়ে ওঠে নি। অন্যান্য কারণের সঙ্গে আমাদের নিজেদের দ্বিধাও ছিল আর একটি কারণ।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকার পাঠকদের মনে পড়বে, 'হোমিওপ্যাথি বিতর্ক', সে-সময় রীতিমতো ঝড়ই তুলেছিল বলা যায়। এবং কিছু কিছু বন্ধুও আমাদের প্রতি দোষারোপ করেছিলেন যে আমরা হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধতায় নেমেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখন আর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই এবং পরিষ্কার করেই একথা বলতে চাই যে, হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধতা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা অস্বীকার করারও উপায় থাকে না যে, বর্তমানে প্রচলিত বিজ্ঞানের নীতি-পদ্ধতির সঙ্গে হোমিওপ্যাথির নীতি-পদ্ধতি একেবারেই খাপ খায় না। এর দ্বারা কখনই বলা যায় না যে, হোমিওপ্যাথির কোনো কার্যকারিতা নেই বা থাকা সম্ভব নয়। বস্তুত অগণিত মানুষের নিজ নিজ অভিজ্ঞতায় যদি হোমিওপ্যাথি কার্যকর বলে উপলব্ধ হয় তবে তাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। মুশকিল হলো হোমিওপ্যাথির নিজস্ব নিয়মনীতি অনুসারেই অনেক মানুষের 'অভিজ্ঞতা'কে সংগ্রথিত করে সাধারণীকরণও করা যায় না। ব্যক্তিগত স্তরে বিশ্বাসের তত্ত্বও একটা তত্ত্ব। বিজ্ঞান এখনও তাকে বিজ্ঞানতত্ত্বে ঠাঁই করে দিতে পারে নি, সেটা বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতাও হতে পারে, হতে পারে কাঠামোগত বা চারিত্রিক ত্রুটি। আবার হোমিও-তত্ত্বের যুগোপযোগী বিকাশ না ঘটাও এর জন্য দায়ী হতে পারে। কারণ যাই হোক, দুই এর মধ্যে যে একটা ফাটল আছে তা অস্বীকার করলেই, সেটা পূরণ হয়ে যায় না। উল্টে থেমে যায় বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রক্রিয়া।

তত্ত্বের তালাশ চলতে থাকবে। কিন্তু রোগ থেকে আরোগ্য লাভ থেমে থাকবার উপায় নেই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ 'প্যাথি'র সরলতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ থাকলে রোগারোগ্যের ক্ষেত্রে আখেরে লাভ বই ক্ষতি তো নেইই!

পূর্ববর্তী সংস্করণ প্রকাশের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিকে ঘিরে ঘটে গেছে এক তুমুল আলোড়ন। ব্রিটেনের বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা *নেচার* হোমিওপ্যাথির ওপর এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশের দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। ফল? নানা ঘটনা ও বক্তব্যের সারাংশ *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*তেই প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে সেটুকু অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

যুক্তিসিদ্ধ প্রশ্ন করা ও তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা নিশ্চয়ই বিরূপতা-বিরুদ্ধতা নয়। বিশ্বাস বা বিরুদ্ধতা অন্ধ হলেই বাড়ে অন্ধকার।

সম্পাদকমণ্ডলী
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা
১৯৯৬

প্রথম বি ও বি সংস্করণের মুখবন্ধ

নিজের বা প্রিয়জনের অসুখ করলে মানুষের মন স্বাভাবিকভাবেই এমন দুর্বল হয়ে যায় যে তখন অপরের সহানুভূতি ও দ্রুত আরোগ্যকামী হয়ে পড়ে। অসুখ যদি গুরুতর বা দীর্ঘস্থায়ী হয় তখন যথেষ্ট বিচক্ষণ ও মনোবলসম্পন্ন লোকের কাছেও যে কোনো পরামর্শ—সে কোনো 'প্যাথি' বা তাবিজ কবচ আংটি যাই হোক না কেন সবই গ্রহণীয় হয়ে ওঠে— এমনকি কিছুটা তার স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিপন্থী হলেও। ব্যাপারটা নিয়ে বার্নাড শ (*Doctor's Dilemma*) বা রাজশেখর বসু (*চিকিৎসা সঙ্কট*) হাস্যরসের সৃষ্টি করলেও বাস্তব অবস্থার অসহায়তা অসংখ্য মানুষকে অহর্নিশ যন্ত্রণা দেয়ই। অসুখ বিসুখে সঠিক চিকিৎসার জন্য কখন কোথায় যেতে হবে তা ঠিক করতে না পেরে অসংখ্য মানুষ নানাভাবে কষ্ট-বঞ্চনা বা অসুবিধেয় পড়ছেন— এ তো সকলের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার দ্বিমাসিক মুখপত্র *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* (*বি-ও-বি*) বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ে তথ্য, বিশ্লেষণ ও আলোচনা করে থাকে। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কি? —এটা আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। সরকারি বেসরকারি নানান কাজকর্ম আচার অনুষ্ঠান রীতিনীতির মূল্যায়ন থেকে সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক নানান বিষয়ক নানান বিষয় ধরে আমরা আলোচনা করি। স্বভাবতই স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাও আলোচনার একটি প্রধান বিষয়। *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* মূলত একটি আলোচনা মঞ্চ। কৃষি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় তত্ত্ব ও প্রয়োগ সমেত একীভূত এক পাঠক্রম ও গবেষণা চললেও চিকিৎসা ব্যবস্থায় এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এদেশে বর্তমানে ২.৭ লক্ষ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানী আছেন, কবিরাজ আছেন ২.৪ লক্ষ, হোমিওপ্যাথ ১.১২ লক্ষ, উনানি ২৯ হাজার আর সিদ্ধ ১৮ হাজার। হোমিওপ্যাথি কলকাতায় এসেছে সওয়া শো বছর আগে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এসেছে তার কিছু আগে। উনানি এসেছে মধ্যযুগে মুসলমান বিজ্ঞান সংস্কৃতির সাথে আর এদেশে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি হলো আয়ুর্বেদ ও সিদ্ধ। আজকের চিকিৎসা ব্যবস্থায় নানান 'প্যাথির' সাথে ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ, মন্ত্র-তন্ত্র সবই চলছে। সরকার বা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সঙ্ঘ থেকে কোনো রকম সুস্পষ্ট নির্দেশক বক্তব্য না থাকায় জনসাধারণ নানাভাবে বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে হোমিওপ্যাথির বর্তমান জনপ্রিয়তা উনানি, সিদ্ধ, কবিরাজী তো বটেই এমন কি কোথাও কোথাও প্রথাগত চিকিৎসা বিজ্ঞানকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

তাই হোমিওপ্যাথি নামক চিকিৎসা পদ্ধতিটির সঠিক সুষ্ঠু মূল্যায়ন একান্ত কাম্য। হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানভিত্তিক, কি বিজ্ঞান-বিরোধী, চট করে এ-রকম কোনো রায় দিয়ে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে কোনো পদ্ধতির ভিতরই অবৈজ্ঞানিক, নির্বিচার কিছু থাকলে তা চিহ্নিত হওয়া দরকার— শুধু হোমিওপ্যাথির বেলায়ই নয়, তথাকথিত অ্যালোপ্যাথির বেলায়ও দরকার, দরকার অন্য যে কোনো প্যাথির ক্ষেত্রেও। আসলে সঠিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থা তো একটিই হবে। তার বদলে নানান শিবির, রোগীর নিজের নিজের আর্থিক সামর্থ্য, বিশ্বাস, অভিরুচি অনুসারে বেছে নিচ্ছে কখনো একটিকে কখনো আরেকটিকে— এই গোটা ব্যাপারটাই

অবৈজ্ঞানিক। আমরা চাইব, একটি বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং তার জন্য সব কটি প্রচলিত পদ্ধতি ও চিকিৎসা-তন্ত্রকে খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে, যাচাই করতে হবে। তবেই বোঝা যাবে, কোন্‌টির ভেতর কতটা কি গ্রহণীয় উপাদান রয়েছে।

একথা মাথায় রেখেই *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*-র পৃষ্ঠায় আমরা হোমিও সংক্রান্ত বিতর্ক প্রকাশ করেছিলাম। বিতর্কটির তাৎপর্য শুধু তাৎক্ষণিক নয়, এ থেকে আরো ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হওয়ার অবকাশ রয়েছে—এই ধারণা বর্তমান সংকলনটি প্রকাশ করা হলো।

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের লেখা 'হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত?' নিবন্ধটির মাধ্যমে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* জুলাই-অগাস্ট ১৯৮১ সংখ্যায়। প্রকাশিত হয় প্রবন্ধটির বক্তব্যকে ঘিরে পাঠক-পাঠিকাদের চিঠিপত্র। সঙ্গে থাকে হোমিওপ্যাথি প্রসঙ্গে শ্রীমজুমদারের আর একটি পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধ। তারপরও হোমিওপ্যাথি বিষয়ে মৌখিক ও লিখিত নানান বিতর্কমূলক বক্তব্য আমাদের কাছে আসতে থাকে বহুদিক থেকে। সেগুলি থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু আলোচনা আমরা প্রকাশ করি *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* পত্রিকার মে-জুন ১৯৮২ সংখ্যায়। সম্পাদকমণ্ডলীর তরফ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে ইতি টানা হয় বর্তমান পর্যায়ের বিতর্কের ওপর। এই সমস্ত আলোচনা ও বক্তব্যই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বর্তমান সংকলনে।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী-র পাতায় লিখিত বিতর্ক ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা একটি সেমিনারের আয়োজন করে ৫ জুন, ১৯৮২ তারিখে, এবং সেমিনারটির সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীতে*।

কেবল সামান্য দুটি সংযোজন অতিরিক্ত ঢোকানো হয়েছে এই সংকলনে। প্রথমটি হলো মে-জুন ১৯৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত শাশ্বত পালের চিঠির একটি বক্তব্য প্রসঙ্গে মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের সংক্ষিপ্ত সংযোজন। শ্রীপালের চিঠির সঙ্গেই পাদটীকা রূপে পরিবেশিত হলো এটি। আর দ্বিতীয়টি *উৎস মানুষ*, মে ১৯৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি চিঠির অংশবিশেষ। *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*-র মে-জুন ১৯৮২ সংখ্যায় যে সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় বক্তব্যটি আমরা রেখেছিলাম, সেটির সাপেক্ষে চিঠিটির কিছু অংশের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। তাই এই চিঠিটির আংশিক উদ্ধৃতি সংযোজিত হলো উক্ত সম্পাদকীয় বক্তব্যের শেষে।

সম্পাদকমণ্ডলী,
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
কলকাতা বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত?

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

চিকিৎসাবিদ্যা সুপ্রাচীন, তবে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়, বিশেষ করে রসায়নে বেশ কিছুটা উন্নতি ঘটার পরেই গড়ে ওঠে সুশৃঙ্খল চিকিৎসা বিজ্ঞান। প্রধানত লুই পাস্তুরের (১৮২২-১৮৯৫) জীবাণুতত্ত্ব আবিষ্কারের পরেই এই রূপান্তর বেগবান হয়। অগ্রগতির পথে অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে নাকচ হয়ে গেছে বহু পুরনো ধারণা। চলে গেছে মন্ত্র-তন্ত্র, যাদু ভেল্‌কির যুগ। এমন কি হোমিওপ্যাথি-অ্যালোপ্যাথিও প্রমাণের অভাবে প্রায় নাকচ।

হোমিওপ্যাথি ও হ্যানিম্যান

প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসাবিদ্ হিপোক্রেটিসের (৪৬০-৩৭৭/৩৯৫ খ্রি. পূ.) মত ছিল : অসুস্থতা সারিয়ে তুলতে প্রকৃতিকে সাহায্য করাই চিকিৎসকের কাজ। রোমান আমলের চিকিৎসক গ্যালেন (১৩১-২০০ খিস্টাব্দ)-এর মত ছিল উল্টো : প্রকৃতিকে জয় করাই কাজ—রোগের সাথে লড়াই করে তার বিনাশ ঘটাতে হবে। গ্যালেনের শিষ্যরা গড়ে তুললেন অ্যালোপ্যাথি ব্যবস্থা ('অ্যালো'র অর্থ ভিন্ন বা উল্টো, গ্রিক 'পেথস্' অর্থে দুঃখ, কষ্ট থেকে 'প্যাথি')। কালে, এই ব্যবস্থা বীভৎস রূপ ধরল : প্রচুর রক্ত বার করা, কথায় কথায় কোষ্ঠ শোধন, কড়া কড়া, প্রায় বিষাক্ত ভেষজ প্রয়োগ, জোর করে বমি করানো। লিডেনের (Leyden) চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক হার্‌ম্যান বোর্‌হাভ (১৬৬৮-১৭৩৮) বলতে বাধ্য হলেন যে, একেবারে কোনো চিকিৎসক না থাকলেই মানব সমাজের কল্যাণ হতো!

এমন যুগে হ্যানিম্যান (১০ এপ্রিল, ১৭৫৫—২ জুলাই ১৮৪৩) হোমিওপ্যাথি শুরু করলেন ('হোমো' 'হোমিও'র অর্থ সদৃশ, like, similar)। এবং তিনিই সনাতনী চিকিৎসার নাম দিলেন অ্যালোপ্যাথি।

পূর্ব জার্মানির স্যাক্‌সনি প্রদেশের মেইসেনে হ্যানিম্যানের জন্ম। তিনি এরলানগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. পাশ চিকিৎসক। জার্মান ভাষায় উইলিয়াম কুলেনের *মেটেরিয়া মেডিকা* অনুবাদ করার সময় হ্যানিম্যান জানতে পারেন যে, পেরুদেশীয় যে সিঙ্কোনা গাছের ছাল দিয়ে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করা হয়, সেই ছালই কোনো সুস্থ লোককে খাওয়ালে তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। নিজে খেয়েও তিনি নিশ্চিত হন এ-ব্যাপারে এর পর ছ-বছর ধরে বিভিন্ন ওষুধ ও ভেষজের প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলি তিনি নিজের, সুস্থ বন্ধুবান্ধব ও অনুগত ছাত্রদের শরীরে লক্ষ্য করতে থাকেন।

এইসব পরীক্ষা থেকে তিনি ধারণা করেন (১৭৯৬) : যে ওষুধে সুস্থ শরীরে কোনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই ওষুধই ঐ রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।

হোমিওপ্যাথির এটাই মূল নিয়ম—'সদৃশ বিধান'বা Law of Similia : Similia similibus curantur (like cures like)।

হ্যানিম্যানের মতে, মানুষের 'আধ্যাত্মিক জীবনীশক্তি' (spiritual life force) ব্যাহত হলে, প্রকাশ পায় রোগ লক্ষণ। তিনি সব রোগকে তিন ভাগে ভাগ করেন : তরুণ রোগ (যা

> চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্যারাসেল্‌সাস (১৪৯৩-১৫৪১) -এর অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি কতকগুলি অসুখের সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং রসায়নের সাথে চিকিৎসাবিদ্যার যোগ নিবিড়তর করেন। তিনিই হোমিওপ্যাথির প্রধান সূত্রের ইঙ্গিত দেন : *মানুষকে যা অসুস্থ করে, অল্প অল্প সেবনে তাই তাকে নিরাময় করে।*

হঠাৎ আক্রমণ করে), মহামারী ও পুরনো রোগ। পুরনো রোগের আট ভাগের সাত ভাগ-ই খোস-পাঁচড়ার রকমফের (variations of psora), এটাও তাঁর মত ছিল। লিপজিগে হ্যানিম্যান চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন ১৮১২ সালে। কিন্তু ১৮২১ সালেই তাঁকে লিপজিগ ছাড়তে হয় সনাতনপন্থী চিকিৎসক ও অ্যাপোথেকারিদের (ওষুধ বিক্রেতা) তাড়নায়। ১৮৪৩ সালে পারীতে তাঁর মৃত্যু হয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে তিনি জীবনে প্রচুর উপার্জন করেছিলেন।

হোমিওপ্যাথির নিয়মগুলি কি যথার্থ?

হোমিওপ্যাথির মূল দৃষ্টিকোণ সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদের (empirical)— 'সদৃশ বিধানের' কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না, সে-বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা বিশ্লেষণের তাই বিশেষ চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। সিঙ্কোনার ছাল খেলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, আবার এটাই ম্যালেরিয়ার ওষুধ : তাহলে—যখন আর্সেনিক খেলে পেট ব্যথা, দাস্তবমি হয়, আর্সেনিক নিশ্চয়ই কলেরার ওষুধ। ওষুধ নির্বাচনের এই আপাতগ্রাহ্য পদ্ধতির ফলে একদিকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ওষুধও হোমিওপ্যাথিতে পাওয়া যায় যেমন আর্নিকা, বেলেডোনা, সিঙ্কোনা; তেমন আবার উদ্ভট ওষুধের অন্ত নেই : ল্যাক্রিমা ফিলিয়া (কাঁদুনে মেয়ের চোখের জল), অ্যাস্টেরিয়াস রুবেন্‌স (গুঁড়ো করা তারা মাছ), মেফাইটিস (ভোঁদড়ের বিষ্ঠা), সাইমেক্‌স লেকটুলারিয়াস (জ্যান্ত ছারপোকার গুঁড়ো) অ্যান্‌থ্রাসাইট (কয়লার গুঁড়ো, ঝিনুকের খোলার গুঁড়ো) অ্যাসিডাম ইউরিকাম (মানুষ বা সাপের মূত্র)। এই ঝোঁকের মধ্যে মধ্যযুগীয় ভেষজবিদ্যা ও কিমিয়ার (Alchemy) প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না কি?

'সদৃশ বিধানের' আর এক ধরনের প্রয়োগ দেখা যায়। রোগীর কয়েক ফোঁটা রক্ত 'তেজী' (পোটেন্ট) করে রোগীকে খাওয়ানো হয়। কোনো ফোঁড়া সারানোর জন্য দেওয়া হয় তারই ফোঁড়ার রস— 'তেজ' বাড়িয়ে। যক্ষ্মা সারানোর জন্য রোগীর থুথু-রক্ত, আমাশা প্রতিকারে রোগীর দাস্ত ছেঁকে রোগীর ওপর প্রয়োগ করা হয়। তাহলে কি অনাক্রম্যকরণ

প্রক্রিয়ার (immunisation) সাথে হোমিওপ্যাথির সাদৃশ্য আছে? *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*-র মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক : 'অনাক্রম্যকরণের অভিজ্ঞতাবাদী অনুশীলনের সঙ্গে ওপর ওপর মিল দেখা গেলেও, হোমিওপ্যাথির যথার্থতার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।'

'তেজ' (পোটেন্সি) ব্যাপারটা কী? হ্যানিম্যানের মতে ওষুধ যত কম বস্তুগত (less material) হবে, তত বেশি হবে তার ক্ষমতা। লঘুকরণ (ডাইলিউশন) করতে করতে না কি ওষুধের পদার্থ 'বিলুপ্ত' হয়ে যায়, পড়ে থাকে এক রহস্যময় রশ্মি, যা রোগ সারায়। সেন্টেসিম্যাল স্কেলে হ্যানিম্যান '৩০ ডাইলিউশন' পর্যন্ত গিয়েছিলেন। গোড়ায় নেওয়া ওষুধ এই পর্যায়ে $১০^{৩০}$ গুণ কমে যায় (ডেসিলয়ন্থ)—বঙ্গোপসাগরে এক চামচ ওষুধ মেশানোর সামিল এই পদ্ধতি। এ ধরনের 'তেজী' ওষুধের গুণ প্রকাশ পেতে ৩০-৫০ দিন লাগতে পারে বলা হয়। জানা কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে ডাইলিউশনের এ-সব গুণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

হোমিওপ্যাথিতে রোগীকে অদ্বিতীয় বলে ভাবা হয়। রোগকে প্রায় বাদ দিয়ে কেবল লক্ষণগুলিকে ধরা হয়। লক্ষণ ধরে এক রোগীর যা ওষুধ হবে, একই রোগে আক্রান্ত আর এক রোগীর ওষুধ তা নাও হতে পারে। অবশ্য হ্যানিম্যানের এই দৃষ্টিকোণের ভালো দিক আছে। তিনি বলতে চেয়েছেন, শুধু রোগ নয়, চিকিৎসাটাও রোগীর দরকার। কিন্তু রোগ ও তার নিরাময়ের বিধিতে কোনো শৃঙ্খলা আনার বিরোধী এই দৃষ্টিভঙ্গি চিকিৎসাকে কখনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে পারে না। তাই দেখা যায়, কোনো হোমিওপ্যাথ দাবি করছেন তিনি এক গ্রেন লবণ ডেসিলিয়ন ডাইলিউশন করে এক ডোজ খাইয়ে ১৩৪৯টি লক্ষণ দেখেছেন!

অবশ্য হোমিওপ্যাথির ডোজ নিয়ে বিতর্কে হ্যানিম্যানের শিষ্যরাই ভাগ হয়ে গেলেন। নব্যপন্থীরা লঘুকরণের ওপর জোর কমালেন। ৩ থেকে ৬ ডাইলিউশনের বেশি আজ প্রায় কেউই ব্যবহার করেন না। খোস-পাঁচড়া তত্ত্বও পরিত্যক্ত।

হোমিওপ্যাথি কেন এল আর কেন চলছে?

ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) ও নেপোলিয়নের যুদ্ধগুলির পরে বিপর্যস্ত বিভ্রান্ত জার্মান সমাজ জীবনে বেশ কিছু আজগুবি তত্ত্ব গজিয়ে ওঠে। এরই একটি হোমিওপ্যাথি। এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ অ্যালোপ্যাথদের নিষ্ঠুর ও উদ্ভট চিকিৎসার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। গত শতাব্দীর শেষদিকে হোমিওপ্যাথি জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠে বিশেষ করে মার্কিন মুলুকে। তারপর পাস্তুর ও অন্য বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারগুলির সময় থেকে এর প্রভাব কমতে থাকে।

আজ জার্মানিতে আধুনিক চিকিৎসক দশ লাখ, আর হোমিওপ্যাথ মোটে পাঁচ হাজার। মার্কিন দেশের ফিলাডেলফিয়া বা ম্যানহাটনের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি কলেজগুলি বিশুদ্ধ হোমিও বিষয়বস্তু কমিয়ে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহু জিনিস পাঠ্যসূচিতে নিয়ে এসে কোনোক্রমে বাঁচার চেষ্টা করছে।

আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর হোমিওপ্যাথির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের হিসেব মতে, বর্তমানে ওদেশে প্রায় ১০০০ জনের মতো এম. ডি. ডিগ্রিধারী ডাক্তার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেন। অবশ্য অন্য হিসেব অনুযায়ী এই সংখ্যা মাত্র ১২৫-এর মতো। যদিও অপেশাদারী হোমিও ডাক্তার বেশ কিছু আছেন। সম্প্রতি যোগ চিকিৎসার সাথে আমেরিকায় হোমিওপ্যাথিরও পুনরাবির্ভাব হচ্ছে (সূত্র : স্প্যান, মে, ১৯৮১, পৃ. ৪০)। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য আমেরিকাসহ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তুক্‌তাক, মন্ত্র-তন্ত্র, বাবা-বাদের পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এও একধরনের সামাজিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিত।

তবু, হোমিওপ্যাথির সব দুর্বলতা সত্ত্বেও বহু সৎ ও বিজ্ঞানজানা মানুষও বলেন : হোমিওপ্যাথির ভিত্তি থাক বা না থাক, ব্যাখ্যা থাক বা না থাক, আমি কাজ দেখেছি তাই বিশ্বাস করি। বিশ্বাসের যেখানে শুরু, বিজ্ঞানের সেখানে শেষ।

আসলে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অনেক অগ্রগতি সত্ত্বেও সব রোগ নিরাময় করা যায় না, নিরাময়যোগ্য রোগও সব সময় সারে না। কিছু কড়া আধুনিক ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ ভীত। আর বিরক্ত—প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারদের অনেকেরই দরদের অভাব, দায়িত্বহীনতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার পরিচয়ে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও চিকিৎসকদের সীমাবদ্ধতার ফলেই মানুষের হোমিও-প্রীতি ঘুচছে না। আর আছে ফল পাওয়ার প্রশ্ন। অনেক অসুখই, এমন কি মারাত্মক হলেও, প্রকৃতির নিয়মে আপনিই সেরে যায় বা কমে আসে। পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি চললে, ঝড়ে বক মরার নিয়মে হোমিওপ্যাথের পশার বাড়ে। আবার কখনো কখনো রোগ সারার মূলে থাকে রোগীর মনের বিশ্বাস।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ফল ঘটতে পারে অভিভাব-স্বাভিভাবের (suggestion and auto-suggestion) জন্য। হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও ওষুধকে চিকিৎসা-কেন্দ্রে যাচাই করার বহু প্রচেষ্টা থেকে কোনো ইতিবাচক ফল পাওয়া যায় নি।

বৃহৎ সোভিয়েট এন্‌সাইক্লোপিডিয়া

ভারতবর্ষে একদিকে বাড়ছে দারিদ্র, অপুষ্টি আর অনাহার। অপরদিকে আধুনিক চিকিৎসকদের মানসিকতা সেবার নয়; না হলে সুশিক্ষিত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হাজারে হাজারে

ধনবান ইংলন্ড আমেরিকাবাসীর চিকিৎসা করতে সাগর পার হতেন না। দুঃস্থ, রুগ্ন মানুষ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসতেই পারে না বা খরচে কুলিয়ে উঠতে পারে না। ভারতে তাই হোমিওপ্যাথের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

ভারতবাসীকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা যোগানোর দায় থেকে ভারতের শাসকেরাও যেন কিছুটা হালকা হতে চাইছেন। তাই কি ১৯৭৩ সালে পাশ হয়েছে হোমিওপ্যাথিক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল আইন আর ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হোমিওপ্যাথির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল? ভারতে যার বয়স সওয়া-শ বছর সেই হোমিওপ্যাথিকে কি তাই দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির মর্যাদা দেওয়া হলো? বলা বাহুল্য, হোমিও ওষুধের বিশুদ্ধতা বা গুণমান পরীক্ষার কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেই।

ভারতবর্ষ মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ-কবচ, জ্যোতিষ, হাত দেখার দেশ। মানুষের শরীর ও জীবন নিয়ে ছেলেখেলা এখানে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আই. এম. এ.-র মতো সংস্থাগুলি জনচিকিৎসার ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার বিরুদ্ধে সরব হলেও চলতি ভুয়া চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির ব্যাপারে নীরব কেন?

সূত্র :

১. সমরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৬২।

২. Medical Encyclopaedia. Collins, ১৯৭৮।

৩. German News, Vol XIX No 19, Oct. 5, ১৯৭৭।

৪. German News, Vol XIX No. 20, Nov. 1, ১৯৭৭।

৫. ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৭৬।

৬. Encyclopaedia Britannica, 15th Ed., ১৯৭৫ 2nd Ed. ১৯৫৭।

৭. Fads & Fallacies in the Name of Science, Martin Gardner, Dover Publications Inc. New York।

৮. Great Soviet Encyclopaedia, 3rd edition, ১৯৭০-এর ইংরাজী অনুবাদ।

৯. 'Healing Power of the Magic Little Pills,' A Statesman Survey. অক্টোবর ৩০, ১৯৭৬।

১০. India, A Reference Annual, ১৯৮০, ভারত সরকার।

১১. আনন্দকিশোর মুন্সী, ভেলকি থেকে ভেষজ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, জুলাই-আগস্ট, ১৯৮১

প্রথম পর্যায়

বিতর্ক মঞ্চ : হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত?

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী-র জুলাই-আগস্ট ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত *'হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত?'* প্রবন্ধের জবাবে কয়েকটি চিঠি এসেছে আমাদের দপ্তরে। এছাড়া বহুসংখ্যক পাঠক মৌখিকভাবে প্রবন্ধটির বক্তব্যের সপক্ষে ও বিপক্ষে (বেশিরভাগই বিপক্ষে) মন্তব্য করেছেন। আমরা চিঠিগুলির বক্তব্য প্রকাশ করছি এই বিতর্ক মঞ্চে। শিরোনাম আমাদের আর এর সঙ্গে থাকছে মূল প্রবন্ধ লেখকের প্রত্যুত্তর। জুলাই-আগস্ট ১৯৮১ সংখ্যার প্রবন্ধটি ছিল মূল রচনার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। ফলে বাদ পড়ে গিয়েছিল প্রয়োজনীয় কিছু বক্তব্য। ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে আর কোনো লেখা বা চিঠি যদি কেউ দিতে চান তবে অনুরোধ রইল, যে বক্তব্যগুলি এখানে বলা হয়ে গেছে তার যেন পুনরাবৃত্তি আর না করেন।

স. ম. *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*

কারণ না জানলে কি ঘটনা মিথ্যা হয়ে যায়?

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় 'হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত?' লেখাটি পড়লাম। লেখকের মন্তব্যে এক জায়গায় দেখলাম, 'চিকিৎসা বিজ্ঞান ও চিকিৎসকদের সীমাবদ্ধতার ফলেই মানুষের হোমিও প্রীতি ঘুচছে না'। স্বভাবতই মনে হয় লেখকের হোমিওপ্যাথির প্রতি মোটেই আস্থা নেই। হোমিওপ্যাথিতে ফল পাওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে, ওষুধে সারে না, সারে আপনা-আপনি, প্রাকৃতিক নিয়মে অথবা রোগীর মনের বিশ্বাসে। আমার প্রশ্ন, যে শিশুর মন এখনও গড়ে ওঠে নি, যে তার রোগ সম্পর্কে কিছুই জানে না— তার যখন অসুখ সারে, সেটি তখন কিভাবে সারে? তার পিতামাতার মনের বিশ্বাসে কি? সর্পাতঙ্কে মৃত্যুর ঘটনা বিরল নয়। বিষহীন সাপের দংশনে অনেক জনকেই মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়তে হয়েছে। একটি বিষহীন সাপের দংশনে একজন মানুষের বিষক্রিয়ায় মৃত্যু নিশ্চয়ই অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার—কিন্তু মৃত্যুটা তো সত্যি; সুতরাং এই সত্য মৃত্যুর সত্য কারণ তো একটা আছে। সর্প-দংশনটা সত্য কারণ হলেও, সত্য কারণটা তো সর্পদংশন উদ্ভূত। অতএব সর্প-দংশনের সাথে মৃত্যুর একটা সম্পর্ক তো নিশ্চয়ই আছে। সম্পর্কটা খুঁজে পাই নি বলে ঘটনাটাকে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হোমিও ওষুধের বিশুদ্ধতা বা গুণমান পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব হয় নি বলে ওষুধের ফলটাকে তো উপেক্ষা করা যায় না। ঘটনা তো একটা ঘটে নি, ঘটনা অনেকই ঘটে। ঘটনাই অনুসন্ধিৎসু মনকে টেনে নিয়ে যায় ঘটনার কারণ জানতে, সৃষ্টি হয় বিজ্ঞান। ঘটনাই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সৃষ্টির মূল কারণ। তাই হোমিও ওষুধ ব্যবহারে ঘটনা যখন ঘটে। তখন কারণ নিশ্চয়ই আছে আমরা কারণ জানতে ব্যর্থ, আর আমাদের ব্যর্থতা তো জনকল্যাণকামী, আশাবাদী বিজ্ঞানকে নিরাশার অমানিশাসম অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে পারে না। নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকতে গিয়ে কোনো ঘটনা অবৈজ্ঞানিক একথা বলা চলে না। যদি কেউ এ-কথা

বিশ্বাস করেন তাতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি না ঘটে অনুসন্ধিৎসু মানসিকতায় হানে চরম আঘাত।

লেখক নিজেই বিশ্বাস করেন মনের কথা, তাই মনের বিশ্বাসে অসুখ সারে একথা তিনি লিখেছেন— কিন্তু মনেরও তো কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। তবে তার প্রভাবে কিভাবে অসুখ সারতে পারে?

যাই হোক, ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল লেখকের কথা মতো উঠে না গিয়ে কাউন্সিলের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার মানবদরদী প্রচেষ্টায় উন্মুক্ত হোক নিরাময়ের হোমিও সংস্করণের একটা দিক।

টি. আহমেদ

বিড়লা ইনডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিকাল মিউজিয়াম।

'আংশিক সত্য মিথ্যার চেয়েও জঘন্য'

হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত? শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানকর্মী শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার মহাশয়ের মনে প্রশ্ন জেগেছে। বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা নিঃসন্দেহে ভালো। তবে যেহেতু বিষয়টা বিজ্ঞান-বিষয়ক— আংশিক সত্য, আংশিক তথ্য, আংশিক তত্ত্ব মূল্যবান প্রবন্ধটিকে অব-মূল্যায়িত করেছে। 'আংশিক সত্য মিথ্যার চেয়েও জঘন্য।' তাই প্রবন্ধকারের আরো সতর্কতার সঙ্গে বিজ্ঞান মানসিকতা বজায় রাখার দিকে নজর দিলে ভালো হতো। ডা. হ্যানিম্যান সংস্কারমুক্ত পর্যবেক্ষক হতে বলেছেন।

প্রবন্ধকার এগারোটা সূত্র-সঙ্কেত দিয়েছেন। এছাড়া অনেক মূল্যবান গ্রন্থও তাঁকে সাহায্য করেছে। সূত্র-সঙ্কেতের মধ্যেও যে গ্রন্থগুলির উল্লেখ আছে সেগুলিকেও পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি বলে মনে হয়। কতকগুলি মনগড়া, কতকগুলি ভাসাভাসা তত্ত্বের ভিত্তিতে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যকে পুরোপুরি না বুঝে বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা লেখা অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক। এই প্রবন্ধের প্রতিটি পয়েন্টের উত্তর দিতে গেলে এই প্রতিবাদপত্রের যা কলেবর দাঁড়াবে এক বছরের সব কটা *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*তে তা প্রকাশের জায়গা হবে না। কারণ পল্লবগ্রাহী উদাহরণ অনেক উল্লেখ করেছেন প্রবন্ধকার।

১. অ্যালোপ্যাথি ও অ্যান্টিপ্যাথিতে গোলমাল করে ফেলেছেন।

২. 'এইসব পরীক্ষা থেকে তিনি ধারণা করেন (১৭৯৬) : যে ওষুধে সুস্থ শরীরে কোনো রোগের লক্ষ্মণ প্রকাশ পায়, সেই ওষুধই ঐ রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।' 'প্রতিষেধক হিসাবে কাজ' করতে পারে বটে কিন্তু হোমিওপ্যাথির মূল নিয়মে আরোগ্যের কথা বলা হয়েছে, প্রতিষেধকের কথা নয়। তাও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, বলা হয়েছে আংশিকভাবে।

৩. Spiritual life force প্রসঙ্গে বলা যায়—Concept of vital force বা জীবনীশক্তি তত্ত্ব সম্বন্ধে আরেকটু গভীরে গেলে vital force, vital principle ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা হতো কিছুটা, যা বোঝার প্রয়োজন আছে। অবশ্য এই বিশেষ কয়েকটা শব্দ [word] সম্বন্ধে বর্তমানের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুলেছেন।

৪. 'পুরনো রোগের আট ভাগের সাত ভাগ-ই খোস-পাঁচড়ার রকমফের 'variation of psora' ; *অর্গনান* এবং *ক্রনিক ডিজিজে* উল্লিখিত এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে psora এবং খোস-পাঁচড়াকে একাকার করে ফেলেছেন। Psora খোস-পাঁচড়া নয়, আবার খোস-পাঁচড়াও সোরা নয়। Miasm সম্পর্কে ধারণার প্রয়োজন।

৫. 'হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে তিনি জীবনে প্রচুর উপার্জন করেছিলেন।' যে দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রবন্ধকার জীবনের শেষ কয়েক বছরের উপার্জন দেখেছেন, সারা জীবনের সাতটি দশকের নিদারুণ অর্থকষ্ট, অনাহার-অর্ধাহার, অত্যাচারে জর্জরিত হওয়া, ২৬ বার গৃহহারা হওয়া, আপসহীন সংগ্রাম কিছুই দেখেন নি, আর সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রবন্ধটা আগাগোড়া রচিত। বিজ্ঞানী হ্যানিম্যান, রসায়নবিদ। হ্যানিম্যান, বহু ভাষাবিদ হ্যানিম্যান, সত্যনিষ্ঠ হ্যানিম্যান, সর্বোপরি দরদী নিরহঙ্কারী হ্যানিম্যানের মূল্যায়নের কোনো চেষ্টাই করা হয় নি। রচনাটা কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত? (উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অনেক রচনাই হোমিওপ্যাথির জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে।) অথবা হোমিওপ্যাথি ও হ্যানিম্যানকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসিকতা থেকে এই প্রবন্ধের সৃষ্টি?

৬. 'হোমিওপ্যাথির মূল দৃষ্টিকোণ সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদের (empirical)' এ-জ্ঞানটা লেখকের হলো কি করে? এটা একেবারে ভুল। ডা. হ্যানিম্যানের রচনা যদি পড়া থাকত তাহলে লেখক দেখতেন, তিনি অভিজ্ঞতাকে, বিশ্বাসকে, এমন কি পূর্বনির্ধারিত ধারণাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তিনি ছোটো বড় প্রতিটি ব্যাপারে বারংবার পরীক্ষা প্রতি-পরীক্ষা না করে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তেই আসেন নি। বাস্তবের সংঘাতে তাঁর সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেছেন। তাই তাঁর জীবদ্দশাতেই পাঁচ পাঁচবার *অর্গানন অফ মেডিসিন*-এর সংস্কার করেছেন। মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন—আমার পূর্ব সিদ্ধান্তের এই এই ভুল ছিল। কাজেই এই সংশোধন হওয়া উচিত। বলেছেন—আমি বলছি বলে অন্ধভাবে আমাকে অনুসরণ করো না। ভুল থাকলে বাতিল করে দাও। Publish the failures। হ্যাকার সাহেব যখন জঘন্য ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করে লিখলেন তখন তিনি বললেন 'এটা গালাগালি দেবার হ্যাকারিয়ান রীতি মাত্র। যুক্তি দিয়ে ভুল প্রমাণ করুন। Truth will never be untruth।'

৭. 'তাহলে—যখন আর্সেনিক খেলে পেট ব্যথা, দাস্তবমি হয়, আর্সেনিক নিশ্চয়ই কলেরার ওষুধ'—অবশ্য যদি আর্সেনিকের লক্ষণসমষ্টি থাকে। আর্সেনিকের লক্ষণ যদি পেট ব্যথা ও দাস্তবমিতে সীমাবদ্ধ রেখে চিন্তাভাবনা করেন তবে সেটা অন্ধের হস্তী দর্শনের থেকে উচ্চ পর্যায়ের কিছু হবে না। আংশিক শর্তে বিজ্ঞান আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয় না। পেট ব্যথা এবং দাস্তবমির লক্ষণ প্রকাশ করতে এবং আরোগ্য করতে পারে এ-রকম ওষুধ ৩৫৬টার খবর যে কোনো *মেটেরিয়া মেডিকায়* পাওয়া যাবে।

৮. 'ওষুধ নির্বাচনে এই আপাতগ্রাহ্য পদ্ধতি,' 'উদ্ভট ওষুধ' প্রভৃতির ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন 'এই ঝোঁকের মধ্যে মধ্যযুগীয় ভেষজবিদ্যা ও কিমিয়ার (Alchemy) প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না কি?' হ্যাঁ, যায়। যদি পূর্ব ধারণার সমর্থনে হাঁসজারু তৈরি করা হয়। বাস্তবে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নির্বাচন পদ্ধতি অত্যন্ত সহজবোধ্য।

৯. সদৃশ বিধানের আরেক ধরনের প্রয়োগ ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন তাকে হোমিওপ্যাথি কে বলল? এ-তথ্য কোন্ গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে? এটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা দরকার। ও-রকম ধরনের কোনো প্রয়োগ হোমিওপ্যাথিতে কস্মিনকালে ছিল না। এখনও নেই।

১০. 'হ্যানিম্যানের মতে ওষুধ যত কম বস্তুগত (less material) হবে, তত বেশি হবে তার ক্ষমতা। ...' হ্যানিম্যানের বক্তব্য সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক— আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। আমাদের ধারণা বক্তব্যটা বুঝতে না পারার দরুন গোলমাল হয়ে গেছে।

১১. 'জানা কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে ডাইলিউশনের এ-সব গুণ ব্যাখ্যা করা যায় না।' ডাইলিউশনের গুণের কথা বলা হয় নি। তার থেকেও দরকারি ও দামি কথা বলা হয়েছে। ডা. হ্যানিম্যানের *অর্গানন অফ মেডিসিন* পড়লে বা বুঝলে, আসল জিনিসটা বোঝাও যায়, ব্যাখ্যাও করা যায়। আধুনিক বিজ্ঞান হ্যানিম্যানের সিদ্ধান্তকে আরো জোরদার করেছে।

১২. '... রোগ ও তার নিরাময়ের বিধিতে কোনো শৃঙ্খলা আনার বিরোধী এই দৃষ্টিভঙ্গি চিকিৎসাকে কখনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে পারে না।' রোগ ও তার নিরাময়ের বিধিতে শৃঙ্খলা যদি কোনো প্যাথিতে থাকে তা হলো একমাত্র হোমিওপ্যাথি। (আর অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় রোগ এবং ওষুধ প্রয়োগের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতাই সব চেয়ে দুর্বল দিক)

১৩. নেট্রাম মিউরে ১৩৪৯টি লক্ষণ আছে বলেই নেট্রাম-মিউরের লক্ষণযুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে প্রাকটিস অফ মেডিসিন-এ উল্লিখিত প্রায় সর্বরোগে এই নেট্রাম মিউর প্রযোজ্য হতে পারে। এবং এ প্রয়োগ আরোগ্যকারী।

১৪. হোমিওপ্যাথির ডোজ নিয়ে বিতর্ক বিষয়ে ধারণাও ঠিক নয়।

১৫. খোস-পাঁচড়া তত্ত্ব নামক উদ্ভট মনগড়া তত্ত্ব কোন্ উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত জানতে পারলে ভাল হয়।

১৬. '...বিভ্রান্ত জার্মান সমাজ-জীবনে বেশ কিছু আজগুবি তত্ত্ব গজিয়ে ওঠে। এরই একটি হোমিওপ্যাথি।' বিজ্ঞান বিষয়ে বিজ্ঞানের ছাত্রদের আজগুবি চিন্তাধারা বিজ্ঞানমনস্কদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার দৈন্যই প্রকাশ করে। না জানা বিষয়ে মতামত যাঁরা প্রকাশ করেন— তাঁরা বিসমিল্লায় গলদ করেন। হোমিওপ্যাথির তত্ত্বটা অনুগ্রহ করে জানুন, বুঝুন, অন্তত বুঝবার চেষ্টা করুন। তারপর না হয় বিচার-বিশ্লেষণ করে, অযৌক্তিক যদি কিছু থাকে, যুক্তি দিয়ে তাকে খণ্ডন করে রায় দেবেন! বিজ্ঞানীদের এত উন্নাসিক হলে চলে?

১৭. 'বিশ্বাসের যেখানে শুরু, বিজ্ঞানের সেখানে শেষ।' হ্যাঁ, ঠিক তাই। হ্যানিম্যান যুক্তিবাদী মন দিয়ে বিচার করতে বলেছেন। বিশ্বাস করতে বারণ করেছেন—No faith, no faith at all.

১৮. 'চিকিৎসা বিজ্ঞান ও চিকিৎসকদের সীমাবদ্ধতার ফলেই মানুষের হোমিও-প্রীতি ঘুচছে না।' কথাটা সত্য। হোমিওপ্যাথি আসলে এই সীমাবদ্ধতার কিছুটা ওপরে অন্য প্যাথির তুলনায়। (তাই ডা. জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ডা. বিধান রায়কে বলেছিলেন, যে

রোগীর চিকিৎসা আপনি পারবেন না, আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন—বেশিরভাগই ভালো করে দেব। বিজ্ঞানের ওপর যথার্থ আস্থার ফলে এক চিকিৎসা বিজ্ঞানী আরেক চিকিৎসা বিজ্ঞানীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পেরেছিলেন।)

১৯. 'প্রাকৃতিক নিয়মে আপনিই সেরে যায়।' বিশ্বখ্যাত ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারও এই একই কথাই একদিন বলেছিলেন। আবার তিনিই যেদিন হোমিওপ্যাথি কি বুঝতে পারলেন, সেদিন নিঃশর্তভাবে সে-কথা প্রত্যাহার করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে।

আরেকটা কথা হলো, ক্রনিক ডিজিজ বিনা চিকিৎসায় কখনো সারে না।

২০. অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও হোমিওপ্যাথির আরোগ্যকর দিকই ভারতে হোমিওপ্যাথির প্রসারের মূল কারণ।

২১. 'হোমিওপ্যাথিকে সরকারি স্বীকৃতি দান করে শাসকেরা চিকিৎসা যোগানোর দায় থেকে হালকা হতে চাইছেন'—এটা বোধহয় যথার্থ নয়। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যতটুকু স্বীকৃতি আদায় করা গেছে তা হোমিওপ্যাথদের সংগ্রাম এবং জনমতের চাপেই হয়েছে। সংগ্রামের ইতিহাসটা নেহাৎ ছোটো নয়।

২২. একটি নির্দিষ্ট শক্তি পর্যন্ত ওষুধের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে।

২৩. গুণমানের প্রমাণ রোগীদের নির্দোষ আরোগ্য।

২৪. আই. এম.. এ.-র মতো সংস্থাগুলো কতকগুলি উন্নাসিকের আখড়া নয় বলে হোমিওপ্যাথিকে ভুয়ো চিকিৎসা বলে মনে করেন না। অনেক স্বনামধন্য অ্যালোপ্যাথ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও তাই হোমিওপ্যাথদের কাছে রোগী পাঠান। ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় খ্যাতনামা অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসকও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেছেন। ভারতে বর্তমানে তার সংখ্যা ২০০-র ওপর।

২৫. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ও বৃহৎ সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়া-র সংকলকরা হোমিওপ্যাথির অথরিটি নন। তাঁরা প্রচলিত ধ্যানধারণার ভিত্তিতেই মন্তব্যগুলি করেছেন বলে মনে হয়। যেমন সাধারণ অভিধানে উল্লিখিত চিকিৎসা-বিষয়ক শব্দের অর্থ যথার্থ হয় না—যা চিকিৎসা-বিষয়ক অভিধানে অধিকতর অর্থবহ রূপ পায়।

হোমিওপ্যাথির বিষয়ে প্রবন্ধকার চিন্তাভাবনা করেছেন, পরিশ্রম করে জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে আহরণ করে সমৃদ্ধ হয়েছেন, এটা খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু তিনি ডা. এস. হ্যানিম্যানের অর্গানন অফ মেডিসিন-এর ষষ্ঠ সংস্করণটা যদি অনুধাবন করতেন, যদি ক্রনিক ডিজিজ, লেসার রাইটিংস পড়তেন প্রবন্ধকারের মতো জ্ঞানী লেখক, বিজ্ঞানের আরেকটা দিকের আলোয় আলোকিত হয়ে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারতেন বলে বিশ্বাস করি।

ডা. বিভাস নন্দী,

হোমিও সমীক্ষা-র সম্পাদকমণ্ডলী পক্ষে

১১৫/ই লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০-০১৩.

'শুধু তত্ত্ব নয়, প্রয়োগে আসুন'

হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানসম্মত কিনা এ-প্রশ্ন নতুন নয়, হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের সময় থেকে এ-প্রশ্ন ছিল। আজকেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এটাই স্বাভাবিক গতির লক্ষণ, প্রগতির সূচক। লেখকও সে-প্রশ্নটি তুলেছেন—সেজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শাখাকে যথার্থভাবে না জেনে বা না বুঝে 'মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ-কবজ, জ্যোতিষ, হাত দেখা' প্রভৃতির মতো ভুয়ো চিকিৎসা পদ্ধতি বলে উড়িয়ে দেওয়া, হেয় প্রতিপন্ন করা, সর্বোপরি জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা কি যথার্থ বিজ্ঞানকর্মীর কাজ? আমরা মনে করি এ-ধরনের কাজ প্রগতির অন্তরায়, এর ফলে প্রতিক্রিয়ার হাতকেই শক্তি যোগায়।

মাননীয় লেখক বন্ধু যে-সব সূত্র ধরে হোমিওপ্যাথকে নস্যাৎ করেছেন হোমিওপ্যাথির ব্যাপারে সে-সব সূত্রই কি কেবলমাত্র অথরিটি? আমরা তা মনে করি না।

বিগত প্রায় দু-শ বছর ধরে হাজার হাজার খ্যাত-অখ্যাত হোমিও চিকিৎসকের হাতে (তন্মধ্যে আমাদের নামজাদা চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের মতো বহু খ্যাতনামা অ্যালোপ্যাথ কনভার্টেড হয়ে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেছেন এমন ডাক্তারের সংখ্যাও সারা বিশ্বে সম্ভবত হাজারের বেশি হবে) লক্ষ লক্ষ চির-অচির রুগ্ন মানুষ নিরাময় লাভ করেছেন (যাদের মধ্যে অ্যালোপ্যাথি বা অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিফল মনোরথ রোগীর সংখ্যাও যথেষ্ট আছেন)। এই বাস্তব সত্যটি ঐ ঐ সূত্রগুলোর চেয়ে কি বড় অথরিটি নয়? বিজ্ঞানকর্মীরা জানেন, 'প্রয়োগ ছাড়া তত্ত্ব বন্ধ্যা,' সুতরাং আমাদের আবেদন, শুধু তত্ত্ব (theory) নিয়ে ব্যস্ত না থেকে প্রয়োগ (practice)-এ আসুন।

'রোগ সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহ অনুরূপ রোগ নিরাময় করে (similia similibus curentur) হ্যানিম্যান ও হোমিওপ্যাথির বহু আগে প্রাচ্যে-প্রতীচ্যের বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও তারপরে মহান হিপোক্রেটিসের এই অন্যতম তত্ত্বে কি ভাববাদ বা ভাগ্যবাদ আছে তা আমরা বুঝি নি। হ্যানিম্যানের অপরাধ হচ্ছে যে, হিপোক্রেটিসের পরবর্তী (বা পূর্ববর্তী) মনীষী বিজ্ঞানীরা তাঁর এই তত্ত্বটিকে পাশ কেটে গেছেন। হ্যানিম্যান গবেষণা তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ-তত্ত্বটিকে তথা চিকিৎসা পদ্ধতিকে একটি বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি দিয়েছেন। কাজেই হোমিওপ্যাথি বা সদৃশ বিধানের তত্ত্ব হ্যানিম্যানের উদ্ভাবন নয়, তাঁর আবিষ্কার মাত্র।

মহান বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচিত ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনী থেকে সামান্য প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি : 'মহেন্দ্রলাল যা সত্য বলে উপলব্ধি করতেন তার বিরুদ্ধাচরণ করতেন না কখনও। প্রকৃত বিজ্ঞানীর এ-মনোভাব তাঁর চরিত্রে ফুটে উঠেছে। তিনি অ্যালোপ্যাথ নীতিতে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। যখন হোমিওপ্যাথিতে সত্যবস্তুর সন্ধান মিলেছে বুঝলেন তখন তাকে বরণ করে নিলেন। তাঁর বিশ্বাস হলো, রোগ শান্তির যে ব্রত গ্রহণ করেছেন তা হয়ত এইভাবে আরো ভালো করে করা সম্ভব হবে। কাজেই অনায়াসে বরণ করলেন হোমিওপ্যাথির পদ্ধতিকে।' (রচনা সংকলন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ১৫৪) মাননীয় লেখক বন্ধুর মতো একই ধরনের প্রশ্নের সমাধানের জন্য 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' গত ১৩ ও ১৪ নভেম্বর, ১৯৮০, একটি হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজন

করেছিলেন। লেখক বন্ধুরাও অনুরূপ একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এগিয়ে যাবার, এগিয়ে নেবার অন্যতম পথ হিসেবে 'সমালোচনা, সমালোচক' কে আমরা সব সময় অভিনন্দিত করি।

হরিমোহন চৌধুরী

হোমিওপ্যাথি ইন্টারন্যাশনাল, ১১৫ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০ ০১৩

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২

প্রতিবাদের উত্তর ও হোমিও প্রসঙ্গে আরো কিছু

এক

বিতর্কিত হোমিও চিকিৎসার ওপর আমার পূর্বেকার লেখার সমালোচনা করার জন্য পত্রলেখকদের ধন্যবাদ। বিজ্ঞানে, সত্যানুসন্ধানে আলোচনা ও সমালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরের সাথে না-বলা আরো কিছু কথা এবারে জানিয়ে যেতে চাই যাতে জনসাধারণ—বিশেষ করে বিজ্ঞানকর্মীরা—হোমিওপ্যাথি কতটা বিজ্ঞানসম্মত তা নিজেরাই বিচার করতে পারেন। চিরাচরিতভাবে পত্রলেখকেরা সজোরে দাবি করেছেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রচুর অসুখ সারে। যা তাঁরা বিশ্বজনীন সত্য বলে ধরে নিয়েছেন, তাতে আমি ছাড়াও বহু সৎ ও প্রবীণ চিকিৎসকদেরও সন্দেহ আছে। 'অ্যালোপ্যাথি' হাসপাতালের জনপ্রিয়তা, উক্ত চিকিৎসায় ভালো ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ ও লোকের 'দায়ে পড়ে অবশেষে অ্যালোপ্যাথের শরণাপন্ন হওয়া' তার প্রমাণ বলে মনে হয়। নানারকম 'ম্যাজিকিওরের' গল্প ছাড়া এ-বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত সুসংবদ্ধ তথ্য কোথায়? অপরপক্ষে, বহুক্ষেত্রে হোমিও চিকিৎসার নামে রোগী বিনা চিকিৎসায় থাকে এবং বহু অসুস্থ শিশু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যথাযথ চিকিৎসা সময় মতো পায় না। ফলে বহু অসুস্থ শিশু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যথাযথ চিকিৎসা সময় মতো পায় না। ফলে বহু শিশু মারাত্মকভাবে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে, অনেকে মারাও যায়। হোমিও চিকিৎসায় কত লোকের কত ক্ষতি হয়েছে তার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে পারলেও তা কম ভয়াবহ হবে না। (এ থেকে যেন এ-ধারণা কারো না হয় যে, তথাকথিত অ্যালোপ্যাথি বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের নামে যা এদেশে চলছে তাতে কোনো ক্ষতি হয় না, তার সবই ভালো।)

দুই

সাধারণভাবে হোমিওপ্যাথদের কাছ থেকে যা শুনি সেই পুরাতন অসার কথা পত্রলেখকেরা আবার বলেছেন। সবিনয়ে জানিয়ে রাখি, মহেন্দ্রলাল সরকার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার সহ দেশী বিদেশী আধুনিক বিজ্ঞান পড়া (FRCS, MRCP, MD, Ph D, D Sc প্রভৃতি ডিগ্রিধারী) তথাকথিত অ্যালোপ্যাথরা হোমিওপ্যাথি করলেই হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানসম্মত হয়ে যায় না। এমন কি শ্রদ্ধেয় সত্যেন বসুর মহেন্দ্রলাল সরকার সম্বন্ধে মন্তব্য থাকলেও না। বিস্তর নামী দামি বিজ্ঞানীরা (!) সাঁইবাবার অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রচার, প্রেতচর্চা, হাত দেখা, কোষ্ঠি বিচার করলেও বিষয়গুলি বিজ্ঞানসম্মত হয়ে যায় না। জীবাণুর আক্রমণে অসুখ হয় না, অসুখ হলেই জীবাণু জন্মায়, টিকা দেওয়ার সুফল নেই ওটা কুসংস্কার, ইত্যাদি ধারণা পোষণ ও প্রচার করলেও জর্জ বার্নাড শ-র এইসব কথা সত্য হয়ে যায় না। স্যার উইলিয়ম ক্রুকস্, স্যার অলিভার লজ, রাসেল আলফ্রেড ওয়ালেস থেকে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, অভেদানন্দ প্রমুখরা পরলোক-সংযোগ করলেও, প্রেততত্ত্ব সত্য হয়ে যায় না। নোবেল বিজয়ী শারীরবিজ্ঞানী চালর্স রিকেট আত্মার সূক্ষ্ম শরীরে নানাস্থানে যাতায়াতের

জন্যে একটোপ্লাজমের উদ্ভট ধারণার উদ্ভাবন ও প্রচার করেন। সুতরাং কোনো বিশেষ বিষয়ে কৃতী পণ্ডিত বা অথরিটির অন্য বিষয়ে মতামত ব্যবহার করে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা ঠিক কি?

তিন : বিচারের মানদন্ড

পত্রলেখক শ্রীনন্দী লঘুকরণ (ডাইলিউশন) তত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মত দাবি করেছেন। 'সদৃশবিধানের আর এক ধরনের প্রয়োগ' হোমিও নয়, আমাদের সোরার (psora) ধারণা ঠিক নয়, বলেছেন। প্রয়োজনীয় vital force, vital energy, vital principle ইত্যাদির ধারণা করতে উপদেশ দিয়েছেন। তাহলে আর একটু বিস্তারিত আলোচনায় যেতে হবে। তাহলে শ্রীনন্দীর কথার উত্তরও হবে, সাধারণের বোঝার সুবিধেও হবে। এর জন্যে হোমিওপ্যাথি সহ আরো কিছু তথ্য, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাঁটতে হবে। আলোচনার শুরুতেই ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন হোমিওপ্যাথিকে কিভাবে বিচার করা হবে : ১. যেভাবে এর ব্যবহার বা প্রয়োগ হচ্ছে সেইভাবে, না— ২. এর তাত্ত্বিক ভিত্তি ও দর্শন দিয়ে? মূল প্রশ্ন হলো, কোন্ চিকিৎসা পদ্ধতিকে হোমিও বলে চেনা যাবে এবং কি দিয়ে? যেভাবে এর প্রয়োগ হচ্ছে তা দেখলে কোনো কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না। কেউ গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে রোগী আকৃষ্ট করেন, কেউ আবার নানা উপসর্গে হোমিও ওষুধের নামে অ্যাসপিরিন, এন্টেরোকুইনল, অ্যান্টিবায়োটিক স্টেরয়েডও দেন। হোমিও ওষুধে কি আছে যাচাই করা দুষ্কর, কারণ হ্যানিম্যানের উপদেশমতো বেশিরভাগ হোমিও চিকিৎসক নিজেদের ওষুধ উৎস (source) থেকে নিজেরা তৈরি করেন না, এমনকি কোন্ উদ্ভিদ, কোন্ প্রাণী, কোন্ ধাতব যৌগ ওষুধের উৎস, তাদের এক খটমট ল্যাটিন নাম ছাড়া বস্তুর সাথে পরিচিতিই নন। হোমিও ওষুধে রোগীরা কেমন ভালো হয় তার কোনো বিজ্ঞানসম্মত পরিসংখ্যানও পাওয়া যায় না। তাই হোমিওপ্যাথির অনুজ্ঞাসূচক সদৃশবিধান যেখানে প্রযুক্ত হচ্ছে তাকেই হোমিওপ্যাথি বলতে হবে। সুতরাং হোমিওপ্যাথির মূল্যায়নে শাস্ত্র ধরে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন। হোমিওপ্যাথদের বাইবেল অর্গানন অফ মেডিসিন-এর ভিত্তিতেই আলোচনা করতে হবে (শ্রীনন্দীর উপদেশ অনুসারেও বটে)। আশা করি মার্জনা পাব কারণ—হ্যানিম্যানের ভাষা—'মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ, তার স্বাস্থ্য ও জীবন, যার ওপর নির্ভর করে সেই চিকিৎসা পদ্ধতির ভিত্তি কতটা ঠিক তার গভীর অনুসন্ধানে কেউ কাউকে নিষেধ করতে পারে না।'

চার : অসুখ হওয়া সারা সম্বন্ধে হোমিও মত

অসুখ কেন হয়, কি করে রোগীকে অসুস্থতা থেকে সুস্থতায় নিয়ে যাওয়া যায়, হোমিও ওষুধ কি করে কাজ করে, হোমিও ওষুধ কি করে বানানো যায়, ইত্যাদি বিষয়ে হ্যানিম্যানের বক্তব্য সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক। হ্যানিম্যান লিখেছেন :

> 'কোনো বস্তু, কোনো কটুতা (acridity), অসুখ ঘটানোর কোনো জিনিসে যে মানুষের অসুখ হয় না তা যে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছেই পরিষ্কার। অসুখ হবার কারণ হলো আত্মার মতো যে জীবনী শক্তি মানুষকে (সুস্থতা-অসুস্থতায়) সঞ্জীবিত রাখে সেই ভাইটাল ফোর্সের গতিময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে পৃ. ৭৮-৯।

অসুখ হবার কারণ *অর্গানন অফ মেডিসিন*-এর ভাষ্যতেই আর একটু শোনা যাক।

> When a person falls ill, it is only this spiritual selfacting automatic vital force, everywhere present in his organism, that is primarily deranged by the dynamic influence upon it by a morbific agent inimical to life; it is only the vital force, deranged to such an abnormal state, that can furnish the organism with its disagreeable sensation, and incline it to the irregular process which we call disease. It is only the morbidly affected vital force (6 ed., 'Energy') alone that produces disease. (পৃ. ৭৮-৯)।

অসুখ তাহলে সারানো যাবে কেমন করে? হ্যানিম্যানের তত্ত্ব, তাঁর বিধান এক রোগ দিয়ে অনুরূপ আর এক রোগ সারাতে হ্যানিম্যান বলছেন :

> A weaker dynamic affection is permanently extinguished in a living organism by a stronger one, if the latter whilst differing in kind, is very similar to the former in its manifestations. (পৃ. ৮৪)।

হ্যানিম্যানের ধারণা ছিল (পৃ. ৮৫-৯), শরীরে অবস্থিত অধিক শক্তিশালী পুরাতন রোগ কম শক্তিশালী আক্রমণকারী নতুন রোগ ঢুকতে দেয় না (রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে পুরাতন দেবরোষ, ভূত, প্রভৃতির ধারণা স্মরণীয়—লেখক।) সমশক্তির হলে পুরাতন রোগের জোর বেশি। কঠিন 'ক্রনিক' রোগে যে ভুগছে, চট করে তাকে 'শরৎকালের ডিসেন্ট্রি'তে বা অন্য কোনো সংক্রামক রোগে ধরতে পারে না। যেখানে স্কার্ভি আছে সেখানে প্লেগ ঢুকবে না, যেখানে কেউ একজিমায় ভুগছে সেখানেও না। ফুসফুসের ক্ষয়রোগ থাকলে মৃদু সংক্রামক জ্বর হয় না। গোলকৃমি (টিনিয়া) থাকলে মৃগীর ফিট হয় না। স্কার্ভি হলে চুলকানি যায়, টাইফাস হলে ফুসফুসের ক্ষয়রোগ বন্ধ থাকে, ইত্যাদি। এখন, আজকের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের থেকে আমরা জানি, এ-সব ধারণাবলীর সবটা ঠিক নয়। এসবে (প্রধানত ভাইরাস ঘটিত অসুখে) সত্যের সামান্য কিছু হয়তো আছে, কিন্তু *হ্যানিম্যান তাকে সর্বজনীন রূপ দিয়ে অপজ্ঞানের রাজ্যে চলে গেছেন।*

হ্যানিম্যান বলেছেন (পৃ. ৩৯), হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে রোগ দূর করতে প্রকৃতির ভাণ্ডারে অসুখের সংখ্যা খুব কম, যেগুলো আছে তারও আবার নানা ঝামেলা। অথচ চিকিৎসকের হাতে বিস্তর সুবিধাজনক রোগনিরাময়কারী অস্ত্র আছে। মনুষ্যদেহ প্রাকৃতিক অসুখে যতটা প্রভাবিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবিত হয় ঔষধ (বা বিষ) ক্রিয়ায়। প্রাকৃতিক অসুখের চেয়ে ভেষজসৃষ্ট অসুখগুলি একই রকম হওয়া সত্ত্বেও শক্তিতে ও গুণে উন্নততর।

এই সব উপলব্ধিতে বলীয়ান হয়ে হ্যানিম্যান নানান বিষ, উদ্ভিজ জান্তব, ধাতব দ্রব্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসায় প্রয়োগ শুরু করলেন। সিঙ্কোনা কম্পজ্বর বা ম্যালেরিয়া সারায় আবার কম্পজ্বর আনে—এই সংবাদ হ্যানিম্যানকে চঞ্চল করে তুলেছিল (১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ)। সদৃশবিধান এল ১৭৯৬ সালে। সেই সময়েই এডওয়ার্ড জেনার বসন্তের টিকা দান শুরু করলেন। আদিম জাদু ধারণায় বিশ্বাসও হ্যানিম্যানকে চট করে এই হঠকারী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করল। হোমিওপ্যাথিতে জাদুবিশ্বাসের দুই মূল নীতিই[২] — হোমিওপ্যাথিক বা সদৃশ জাদু ও কন্টাজিয়াস বা সংস্পর্শ জাদু—সক্রিয় দেখা যায় (এককালে ন্যাবারোগ সারানোর জন্য জাদুবিশ্বাস অনুসারে সোনা খাওয়ানো হতো, হলদে পাখি কিনে ন্যাবারোগীকে

তারদিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। জাদুকে বিশিষ্ট পণ্ডিত ফ্রেজার Barren Art. Spurious System of Natural Law ইত্যাদি বলেছেন ও বিশদভাবে তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন)। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে ইমিউনোলজি থেকে জানা যায়[২] যে, রোগ সৃষ্টিকারী কোনো 'প্যাথোজেন' (জীবাণু, ভাইরাস, বিষ ইত্যাদি) শরীরে ঢুকলে নিজেকে রক্ষা করার জন্য শরীর কখনো কখনো 'অ্যান্টিবডি' তৈরি করে নেয় বা তৈরির কৌশল আয়ত্ত করে নেয়। যার জন্য অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, বিশেষ সেই অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধেই শরীরের প্রতিরক্ষা হয়, অন্যের জন্য নয়। এক জাতের ভাইরাসের বিরুদ্ধে শরীরে অ্যান্টিবড়ি থাকলেও প্রায়ই কাছাকাছি জাতের ভাইরাসের বিরুদ্ধে তা কাজে দেয় না। তাই সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, এন্‌কেফালাইটিস ইত্যাদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া আজও অসুবিধের। তাই উদ্ভিদের কোনো অ্যালকালয়েড, গ্লাইকোসাইড অল্প ডোজে দিয়ে জীবাণু ভাইরাস বা অন্য জাতের 'টক্সিন'ঘটিত অসুস্থতার প্রতিবিধান সদৃশবিধান অনুযায়ী সম্ভব নয়। সুতরাং হ্যানিম্যানীয় হোমিওপ্যাথির মূলনীতি— সদৃশবিধানের ভিত্তিই ভ্রান্ত।

পাঁচ : অচল তত্ত্বাবলী

ক. এইবার আসা যাক মিয়াজম, ভাইটাল ফোর্সের তত্ত্বে, অ্যালোপ্যাথি ওষুধের হ্যানিম্যানকথিত মারাত্মক কুফলে এবং রোগ নয়, সমগ্র রোগীর চিকিৎসার হ্যানিম্যানীয় ধারণায়। বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, বিশ্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যত বেড়েছে, সেগুলি চিকিৎসা-চিন্তা ও চিকিৎসা পদ্ধতিকেও তত প্রভাবিত করেছে। ভূ-কেন্দ্রিক প্রাচীন ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বে বিশ্ব ছিল macro-cosmos এবং ধারণা ছিল ঈশ্বর সেই ধাঁচে মানুষ তৈরি করেছেন[৪,৫] মনুষ্যদেহ হলো micro-cosmos। প্রাচীন গ্রিকদের (হিন্দুদেরও) ধারণা ছিল চারটি মূলধাতু (element) –আগুন, বাতাস জল ও মাটি — যেমন বিশ্বের সবকিছুর মূলে আছে, তেমনি মনুষ্যদেহের ক্ষুদ্রবিশ্বে আছে রক্ত, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও কালোপিত্ত। চিকিৎসা-চিন্তায় এই সব হিউমারের (humour) ভিত্তিতে অনুপাত অনুসারে মানুষ সজীব, খিটখিটে, নিষ্প্রভ এবং বিষাদগ্রস্ত (sanguine, choleric, phlegmatic, melancholic) হয়। বায়ু পিত্ত ও কফের ত্রিধাতু তত্ত্বের সাথে গ্রিকদের হিউমার তত্ত্বের মিল দেখা যায়—যা হিপোক্রেটিস গ্যালেন প্রমুখ পুরাতনরা প্রায় সবাই বিশ্বাস করতেন। হ্যানিম্যান এর বদলে করলেন মিয়াজম তত্ত্বের আমদানি। 'Miasmata' শব্দ থেকে সম্ভবত হ্যানিম্যান Miasm বানিয়েছেন এবং সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস (psora, sycosis, siphillis) এই তিন মিয়াজম হোমিওপ্যাথির গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। হিপোক্রেটিসের মিয়াজমটা ছিল ঠাণ্ডা, গরম, বাতাস (cold, sun, winds)। এগুলি ছিল রোগসৃষ্টিকারী দেবরোষজাত কু-বাতাস। স্বপ্ন ও স্মৃতির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা থেকে পুরাতন প্রস্তর যুগে আদিম মানুষ আত্মার অলীক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিল।[৬] কালক্রমে আত্মার দৈহিক ও মানসিক দুরকম কাজ মানুষ ভাবল। দৈহিক গঠন[৭] কিছু জানার পর আত্মা তিন রকম হয়ে গেল : লিভারে থাকে স্বাভাবিক আত্মা (natural soul) হৃৎপিণ্ডে থাকে জীবাত্মা (animal soul) আর মস্তিষ্কে থাকে বুদ্ধি বা আত্মা (rational soul)। এরা ঠিক মেজাজে থাকলে লোক ভালো থাকে।

সোরার অর্থ খোসপাঁচড়া করায় পত্রলেখক শ্রীনন্দী যথার্থভাবেই আপত্তি তুলেছেন। কিন্তু সোরার (psora) অর্থ[১] খোস-পাঁচড়াও হয় এবং সোরিনাম এই হোমিও ওষুধ খোস-পাঁচড়ার রস থেকেই হয়।[২] তবে সঠিক হ্যানিম্যানীয় অর্থে সোরা একটি মিয়াজম যাকে ঘাঁটালে খোস-পাঁচড়া প্রভৃতি বাড়তে পারে। হ্যানিম্যান বলেছেন (পৃ. ১১৫) 'সিফিলিটিক ও সাইকোটিক বাদ দিলে সত্যকার অন্যসব পুরাতন রোগের মাতা হলো সোরা।' হিউমার বা আয়ুর্বেদীয় ত্রিদোষ মতে, হ্যানিম্যানের মিয়াজম তত্ত্বও পরিত্যাজ্য।

খ. রোগ নয়, সমগ্র রোগীর চিকিৎসা করতে হবে—এর মধ্যে 'দেহ ও আত্মা' এই সমগ্রকেই হ্যানিম্যান বোঝাতে চেয়েছেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দেহ ও মন বা 'সাইকোসোমাটিক' ধারণা এটি নয়। অনিষ্টকারক মিথ্যা অ্যালোপ্যাথি ওষুধের ভেতর দিয়ে এক 'irrational vital force' শরীরে ঢুকে অসংখ্য অসুখ জাগিয়ে তোলে ('kindles the countless diseases')। জীবকে যন্ত্র হিসাবে বোঝা সম্ভব বলে ডেকার্টে বোরেলি, গ্যালভ্যানি, হেলমহোলজ, ক্লড বার্নাড, চার্লস ডারউইন প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা মনে করতেন।[৪,৫,৬] এরা যন্ত্রবাদী (mechanists)। এর বিপরীতে সুপ্রাচীন কাল থেকে বেশির ভাগ লোক (আজও অনেকে) উল্টো বিশ্বাস করতেন।[৪,৫] জে. ডি. বার্নাল (পৃ. ৯৩৭) লিখেছেন : 'দেহকে আকৃতি, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য দেয় যে ভাইটাল ফোর্স সেই আত্মা, মন বা ভাইটাল ফোর্সের তত্ত্ব হলো একটি অতি পুরাতন জাদু ধারণা, যাকে গ্রিকরা যুক্তি দিয়ে দাঁড় করিয়েছিল এবং আরবদের মাধ্যমে যা আধুনিক বিজ্ঞানে ঢুকে পড়েছিল।' লোকে ভাবত আত্মা মন বা প্রাণশক্তির (soul psyche or breath of life) মতো দেহাতিরিক্ত একটা কিছু আছে যা জীবকে বিশেষত্ব দেয়। কিন্তু কোপার্নিকাস থেকে নিউটন পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে নানা বৈপ্লবিক আবিষ্কারের ফলশ্রুতিতে পুরাতন বহু ধারণার ভিত্তিই ধসে পড়ে। তার প্রতিক্রিয়ায় আত্মার বদলে ফ্লোজিস্টন-তত্ত্ব খ্যাত স্টাল (১৬৬০-১৭৩৪) অ্যানিমা (anima) কথার প্রচলন করলেন। এটিই পরে ভাইটাল ফোর্স রূপে হ্যানিম্যানের চিন্তায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করল। হ্যানিম্যান বিশ্বাস করতেন মানুষকে জীববিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, রাসায়নবিদ্যা দিয়ে বোঝা যায় না, কখনো বোঝা সম্ভবও নয়।

যন্ত্রবাদী ও প্রাণবাদীদের বিরোধে এক বিজয় হয় ১৮২৮ সালে ভোল্‌হারের আবিষ্কারের ফলে। চরম বিজয় অবশ্য বিংশ শতকের আগে হয় নি। জীবনীশক্তি রহিত অজৈব জড় জগৎ থেকে জৈব পদার্থ আসতেই পারে না—এই ধারণার মূলে ঘা পড়ল অজৈব পদার্থ থেকে ভোল্‌হারের ইউরিয়া সংশ্লেষণের মাধ্যমে। শতসহস্র বিজ্ঞানী ও সাধকের পরিশ্রমের ফলে জীবের পুষ্টি, শ্বাস-প্রশ্বাস, বংশবৃদ্ধি, রোগব্যাধি, মস্তিষ্ক, মনস্তত্ত্ব, স্নায়ুতন্ত্র, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি সমূহের কার্যাবলী সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বেড়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হয়েছে। হোমিওপ্যাথি তার ভ্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে তাই এগোতে পারল না।

গ. হ্যানিম্যান বলতেন, অ্যালোপ্যাথদের রোগের লক্ষণ উপশম করবার জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি (antipathic, enantiopathic or palliative method) একেবারেই ভুল ও ক্ষতিকর। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী জ্বর, খোস, দাস্ত, ব্যথা, বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ ফুটিয়ে শরীর নিজেকে ভালো করতে চায়। চিকিৎসকের—হোমিও চিকিৎসকের— কাজ হলো ওষুধ দিয়ে অনুরূপ রোগ লক্ষণ আরো ফুটিয়ে প্রকৃতিকে সাহায্য করা যাতে শরীর সুস্থ হয়। রোগীকে ভালো করে

পর্যবেক্ষণ করে রোগের ভাষা বুঝতে হবে এবং সুস্থ লোকের শরীরে ওষুধ কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা দেখে ওষুধের ভাষা বুঝতে হবে। এই পদ্ধতিতেই similia similibus curentur করে রোগীকে সাহায্য করা যাবে। সর্বত্র এই ধারণার প্রয়োগ যে ক্ষতিকারক তা সহজেই অনুমান করা যায়। সোনামুখি, রেউচিনি, (Senna Rhuburb) প্রভৃতির পেটব্যথা, দাস্ত কমাবার ক্ষমতা আছে অতএব হোমিও মতে ডিসেন্ট্রিতে এগুলো ওষুধ। পুড়ে গেলে গরম লাগাতে হবে, 'ফ্রস্টব্রাইট'-এ বরফ লাগাতে হবে, ধুতুরায় মানসিক বিকার আনে অতএব উন্মাদ রোগীকে ধুতরো খাওয়াতে হবে, ইত্যাদি ছিল হ্যানিম্যানের বিধান।

ঘ. অ্যালোপ্যাথদের বিপরীত বিধানে (Contraria Contralis Curentur) ওষুধে নতুনতর রোগ সৃষ্টি হবেই এবং যেহেতু দুইটি রোগ বিসদৃশ অতএব হ্যানিম্যানের বক্তব্য আগের রোগ তো সারবেই না—হয়তো সাময়িক চাপা পড়ে থাকবে, পরে অধিকতর ভয়াবহতা নিয়ে আবার দুরারোগ্য হয়ে ফুটে উঠবে এবং নতুন ও পুরানো রোগ মিলে ভীষণ জটিলতা সৃষ্টি করবে। হ্যানিম্যানের ওষুধের এই প্রাথমিক ও পরবর্তী ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার (primary and secondary reaction) ধারণা আর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওষুধজাত অসুস্থতার (iatrogenic disease) ধারণা এক নয়।

ছয় : ঔষুধ তত্ত্ব

এবারে হোমিও ওষুধ এবং তার লঘু ও তেজীকরণের প্রসঙ্গে আসা যাক।[১,৭,৮]। পাশ্চাত্যদেশে এখনো যে সামান্য কিছু লোক এবং যারা সকলেই প্রথাগত (orthodox) চিকিৎসাবিজ্ঞানে এম. ডি. কিছু হোমিও ওষুধ ব্যবহার করেন, তাঁরা মূল আরক (মাদার টিংচার) বা চার-ছয় ডাইলিউশনের নিচে যানই না। অথচ *হ্যানিম্যানের মতে ঐ মাত্রার ওষুধ হোমিওই নয়।* তিনি তিরিশ ডাইলিউশনকেই সাধারণ ব্যবহার্য বলেছেন। হ্যানিম্যানের মতে অতি সামান্য মাত্রায় ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে রোগীর শরীরে উপস্থিত রোগশক্তির বিপরীত এক শক্তি ভাইটাল ফোর্সে সৃষ্টি করে রোগের স্থায়ী উপশম করতে হবে। তাঁর ধারণায় অল্প ডোজের হোমিও ওষুধেও পদার্থ থাকে (পৃ. ১০৬)। তৎকালীন রসায়নের উন্নতির স্তরে হ্যানিম্যানের মতো লোকের পক্ষে এটা ভাবা খুব অস্বাভাবিক ছিল না, কারণ অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প (১৮১১) ক্যানিজারোর (১৮৫৮) আগে চালুই হয় নি। *হ্যানিম্যান আর একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগত ভুলের শিকার হয়েছিলেন।* প্যারাসেলসাস, সিডেনহাম (১৬২৪-৮৯) প্রভৃতির ধারণা ছিল (যা বহুলাংশে সত্য) যে, সব জিনিসই বেশিমাত্রায় বিষ, অল্পমাত্রায় হিতকারী ওষুধ। লবণ, অ্যালকোহল, আর্সেনিক, স্ট্রিকনিন প্রভৃতির উদাহরণ তো সাধারণ। এই সীমাবদ্ধ সত্যের সীমানা ভেঙে দিয়ে হ্যানিম্যান একেবারে অপজ্ঞানের রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন। হ্যানিম্যান বলতেন, 'এইভাবে যে-সব রাসায়নিক তৈরি হবে, সেগুলি রসায়নের নিয়মের আওতার বাইরে থাকে।' বিজ্ঞান দিয়ে আজো এই উদ্ভট তত্ত্বকে পরিবেশন করার প্রয়াস[১০] দেখা যায়।

সাত : হোমিও ফার্মাকোপিয়া

হাজার দুই-তিন হোমিও ওষুধ আছে যার মধ্যে মাত্র ডজন খানেক সমধিক বেশি ব্যবহার হয়। হোমিও ওষুধে সামান্য পরিচয়[১,৭,৮,৯] প্রাসঙ্গিক। যা দেখেছি তাতে হোমিও ওষুধগুলিকে

নিম্নোক্ত কটি ভাগে ভাগ করা যায়। ক. উদ্ভিজ্জ, খ. ধাতব ও লবণ জাতীয়, গ. জীবজন্তুর বিষ, ঘ. নসোড (Nosode)—সংক্রামক রোগ, ঘা প্রভৃতির রস থেকে তৈরি হয়, চ. বিবিধ। জৈব অজৈব যে কোনো বস্তু থেকেই হোমিও ওষুধ তৈরি হতে পারে। হ্যানিম্যান ১৭৭৬ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত ৯৯টি ওষুধ 'প্রতিষ্ঠা' (proving) করেছিলেন। এখনো নতুন নতুন হোমিও ওষুধ প্রতিষ্ঠা হচ্ছেই। কোনো একজন চিকিৎসক ওষুধ বার করেন, অন্যেরা তা প্রয়োগ করেন, রোগীরা 'ভালো হয়।' মেদিনীপুরের হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ক্লোরাম্‌ফেনিকল (১৯৫৯-৬০), কির্টিজন (১৯৬১-৬২) হোমিও ওষুধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিখ্যাত কিছু হোমিও ওষুধের উৎস পরিচিতি পাঠকের পক্ষে সহায়ক হবে।

ক. এই জাতের ভেতর পেঁয়াজ, পাহাড়ী গুল্ম *(Arnica montana)*, হিঙ, বিছুটি, বিষকাঁঠালী *(belladona)*, লতানো এক ফলের গাছ *(Bryonia)*, কর্পূর, গাঁজা, মরিচ, কাঠ কয়লা *(Carbo vegetabilis)* সিঙ্কোনা *(China)*, হেমলক লতা, ইপিকাক *(Ipicacuanha)*, হাতিশুঁড় লতা *(Lycopdium)* জায়ফল *(Nux Moschata)*, কুচিলা *(Nux Vomica)*, আফিম, বিষাক্ত ওক *(Rhus Tox)*, গাঁদা, সেডার গাছ *(Thuja Occidentalis)*, যুঁই, ধুতরা *(Strammonium)*, তামাক ইত্যাদি দেশ বিদেশের লোকচিকিৎসায় ব্যবহৃত অসংখ্য গাছপালার ফুল, লতা-পাতা, শেকড়-বাকড়ের রস বা গুঁড়ো, জল বা অ্যালকোহল দিয়ে মাদার টিংচার বানানো হয়। তারপর তার দু-ফোঁটা নিয়ে ৯৮ ফোঁটা দিয়ে এক ডাইলিউশনের ওষুধ হয়। একই পদ্ধতিতে দুই, তিন ইত্যাদি মাত্রার ওষুধ তৈরি হয়। প্রতিবারই ভালো করে ঝাঁকিয়ে ওষুধের শক্তি বৃদ্ধি করা হয় (potentization)। বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ ছাড়াও acetic acid, picric acid, nitroglycerine, salicylic acid, petroleum) প্রভৃতি ওষুধের উৎস। হ্যানিম্যান বলতেন, ওষুধ বিশুদ্ধ সহজ-সরল হবে। অ্যালোপ্যাথদের মতো মিশ্র ওষুধ ব্যবহার করা ক্ষতিকারক। অদ্রাব্য বা কঠিন পদার্থের জন্যে সুগার অফ মিলক বা ল্যাকটোজ দিয়ে ঘষে (trituration) অনুরূপভাবে ওষুধ বানাতে হবে।

খ. এই জাতের ওষুধের উৎসে যে সব নাম আছে ইন্‌অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরিতে তাদের প্রায় সবকটিকে পাওয়া যায়। যথা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, অ্যামোনিয়াম, ব্রোমিন, ক্যালসিয়াম সালফেট, ফসফেট, কার্বোনেট, কস্টিক পটাশ, মারকিউরিক ও মারকিউরাস ক্লোরাইড, পারদ, সোনা, তামা, টিন, সীসা, লোহা, গন্ধক, ফসফরাস, আয়রন অ্যাসিটেট, ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ফসফেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড (লবণ),-সালফেট, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ও সিলিকা (বালি) ইত্যাদি।

গ. জীবজন্তুর বিষ—হ্যানিম্যানের ধারণা ছিল যে দ্রব্য যত বেশি বিষ, সুস্থ লোককে যা যত বেশি অসুস্থ করতে পারে, সেটা তত কার্যকর ওষুধ। এই ধরনের ওষুধের কিছু নমুনা — crotalus Horridus (র‍্যাটলে সাপের বিষ), lacheis (সুরুকিয়া সাপের বিষ), naja Tripudians (গোখরো সাপের বিষ), নানা জাতের মাকড়সার বিষ দিয়ে tarantuala Hispania and Cubens, Theridian, Cantharides, Apis Melifica (মৌমাছির বিষ) Sepia (সামুদ্রিক কাটল মাছের কালি) Lac Felinum (বেড়ালের দুধ) Lac Caninum

(কুকুরের দুধ), Lac Vaccinum (গরুরু দুধ) ইত্যাদি।

ঘ. নসোডগুলির মধ্যে *Morbilinum* (হামের রস), *Medorrhinium* (প্রমেহ বা গণোরিয়ার রস), *Psorinum* (খোস-পাচড়ার রস), *Pyrogen* (পচা ঘায়ের রস), *syphilinum* (সিফিলিসের রস), *Variolinum* (বসন্তের গুটির রস)। এই রকম *Diptherinum, Tuberculinum, Hydrophobinum, Anthracinum, Carcinosin* প্রভৃতি ছাড়াও প্রচুর আন্ত্রিক নসোড (*Bowel Nosodes*) আছে।

পত্রলেখক শ্রীনন্দী বলেছেন সদৃশবিধানের আর এক ধরনের প্রয়োগ সম্বন্ধে আগে আমরা যা বলেছি তা হোমিওপ্যাথি নয়। নসোডগুলো তাহলে কী?

ঙ. সারকোড Adrenal Cortex, Thyroxine গ্রন্থি থেকে সারকোড তৈরি হয়। **চ.** বিবিধ : এইসবের ভেতর প্রচুর মজাদার আইডিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। এগুলোও কি বিজ্ঞানসম্মত? নমুনা, *Magnetis polus Arcticus* (চুম্বকের উত্তরমেরুজাত), *Magnetis polus Australis* (দক্ষিণ মেরুজাত), *Electricitus* (বাতাস ও স্থির বিদ্যুৎজাত), *Sanicula* (প্রস্রবনের জলজাত), আর *Sol* হলো কড়া রৌদ্রের অ্যালকোহলীয় দ্রবণ।

বিষের ভেষজগুণ, মেসমারের অলৌকিক জৈব চুম্বকত্ব (animal magnetism) ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতিতে হ্যানিম্যানের ছিল গভীর বিশ্বাস। তাঁর ধারণা ছিল, স্বাস্থ্যবান শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি থেকেও ভেষজগুণ-সম্পন্ন তেজ বেরিয়ে আসে এবং অন্য কোনো রোগীর দেহে ঢুকে রোগ নিরাময় করতে পারে। মৃত, আপাত মৃত ব্যক্তিকেও জৈব চুম্বকত্ব দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা যায়। পুরাতন চিকিৎসা যে 'mish mash of religion magic and empirically acquired ideas and practices' (Henri Sygerist) ছিল, হ্যানিম্যানীয় হোমিওপ্যাথিতে তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। বর্তমান লেখক আন্তর্জাতিক একটিও প্রামাণ্য বই বা রচনা বার করতে পারে নি যেখানে হোমিওপ্যাথিকে অপজ্ঞান ও বিভ্রান্ত না বলা হয়েছে।

আট : বিজ্ঞানের ইতিহাস ও হোমিওপ্যাথি

আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের শুরু অষ্টাদশ শতকের শেষদিকের রাসায়নিক সংযোজনের সূত্রাবলী ও ডালটনের পরমাণুতত্ত্ব (১৮০৩) আবিষ্কার থেকে। রসায়নের জন্মদাতা বলে পরিগণিত ল্যাভসিয়েরের সময় O, N, H, S, P, As, Sb, Cu, Fe, Au, Ag সহ মাত্র তেইশটি মৌলিক পদার্থ জানা ছিল। ল্যাভসিয়েরের মতো বিরাট প্রতিভার লোকও চুন, ম্যাগনেসিয়া, (MgO) অ্যালুমিনা (Al_2O_3), বালি (SiO_2), আলো, ক্যালোরিক প্রভৃতিকে মৌলিক পদার্থ মনে করতেন। জৈব রসায়নের তখনো জন্মই হয় নি। যুগ এগিয়ে গেছে। তাই এখনকার যে কোনো হাইস্কুলের ছাত্র ল্যাভসিয়েরের চেয়ে বেশি কেমিস্ট্রি জানে। সেখানে এখনকার হোমিওপ্যাথদের বিচারে হ্যানিম্যান বিরাট চিকিৎসক, মস্ত কেমিস্ট। আধুনিক জীব ও শারীরবিদ্যার তখন প্রায় কিছুই ছিল না, তথাপি হ্যানিম্যান মস্ত চিকিৎসক এবং তার রচনাসমূহ ধর্মগ্রন্থের মতো হোমিওপ্যাথদের মধ্যে আজও চর্চিত, জীবন্ত। অথচ তখনকার অন্যান্য মহাবিজ্ঞানীরা ইতিহাসের পাতায় যে যার স্থান নিয়েছেন। *হ্যানিম্যান নতুন এক কুসংস্কার তৈরি ও প্রচার করে সাফল্যের সঙ্গে গ্যালেনপন্থীদের পুরাতন কুসংস্কার দাবিয়ে সৌভাগ্যবান হয়েছিলেন।*

হ্যানিম্যানের আগেই দর্শন, রসায়ন ও শারীরবিজ্ঞানে এমন বেশ কিছু অগ্রগতি ঘটে, যার ফলে পুরাতন বহু ধারণা ধসে পড়ে। বার্নাল লিখেছেন (পৃ. ৬৪৬) : 'চিকিৎসা দর্শনের মূলভিত্তি হিউমার তত্ত্ব রসায়ন ও জীববিদ্যার অগ্রগতিতে ভেঙে পড়ে। অথচ উনবিংশ শতকের প্রথম পর্যন্ত এই শূন্যতায় কার্যকর নতুন কিছু আসে না। এর ফলে এমন এক যুগ আসে যেখানে নানা উদ্ভট তত্ত্ব (wild speculation) ও পদ্ধতি গঠন চলতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মেসমারের (১৭৩৪-১৮১৫) জৈব চুম্বকত্ব, গলের ফ্রেনোলজি বিরাট জনপ্রিয়তা পায়। অথচ এরা অনুপ্রাণিত আত্মপ্রত্যয়ী হাতুড়ের বেশি ছিল না।' হ্যানিম্যান ও হোমিওপ্যাথি এই যুগেরই ফসল (১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)। হ্যানিম্যান পুরাতন ও পরিত্যক্ত আত্মার তত্ত্বকে জীবনীশক্তি বা ভাইটাল ফোর্স, কবিরাজদের ধাতু ও প্রাচীন গ্রিকদের হিউমার তত্ত্বকে মিয়াজম, দৈবশক্তিকে ওষুধের তেজ বা পোটেন্সি—এইসব কথার আড়ালে নিজের মনগড়া এক চিকিৎসাশাস্ত্র তৈরি করেছিলেন যার সবটাই আধুনিক বিজ্ঞান বিরোধী। হ্যানিম্যানের চিকিৎসা চিন্তায় অজ্ঞেয় ঈশ্বরের বিশেষ প্রাধান্য, Creator, preserver of mankind, Benevolent Deity, Divine Grace প্রভৃতি কথার ছড়াছড়ি এবং তখনকার ভিন্নমতের চিকিৎসকদের অ্যালোপ্যাথ, ভ্রান্ত, পীড়িতের অনিষ্টকারী, বস্তুবাদী (materialist) ইত্যাদি বলে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলতেন, বিজ্ঞান দিয়ে মানুষের দেহকে বোঝা যায় না, বোঝা কখনো সম্ভবও নয়।

আর একটা কথা বলেই শেষ করব। হোমিও বিতর্কে আধুনিক যুগ ও পুরাতন যুগের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য মনে রাখা উচিত। এই যুগের বিজ্ঞানে তথ্য—খাঁটি তথ্য ও আইডিয়ার ভীষণ কদর। কোনো পদ্ধতিতে, কোনো ওষুধে অসুখ সারে—এটা যদি ঘটনা হয়, তবে তা বোঝা যাক বা না যাক তা দীর্ঘদিন অবহেলিত অনাদৃত থাকে না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বিরাট পৃথিবীর শতসহস্র বছরের লক্ষ লক্ষ সাধারণ-অসাধারণ কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারসংকলনের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তার সার্থক ও সফল প্রয়োগই কাম্য। জাদু ও দৈববিশ্বাস সমৃদ্ধ উদ্ভট শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হোমিওপ্যাথির সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না, যা অন্তত কিছুটা আয়ুর্বেদের আছে।[১৪]

সূত্র :

১. S Hahnemann, *Organon of Medicine*, 5th ed. (1833) (includes changes of 6th ed.) Tr. and Ed. by R. F. Dudgeon and William Boericke (2nd Indian ed. 1970)

২. Sir James Frazer, *The Golden Bough* (Abridged ed.) Macmillan & Co, 1956.

৩. Ed. –Davies, Dulbecco, Eisen, Ginsberg & Wood, *Microbiology* 2nd ed, Harprer International, 1973.

৪. J. D. Bernal, *Science in History*, Vols. I-IV, Penguin 1969.

৫. P. P. Weiner (Ed), *Dictionary of the History of Ideas*, Charles Scribner's Sons, N. Y. 1973, Vol II, p.395-407, Vol III, p. 126-46.

৬. *Encyclopaedia Britannica*, 1975 15th ed, 8 : 752, 10 : 773, 2 : 1026, 17 : 566.

৭. H. C. Allen, *Keynotes and Characteristics with Comparisons of Some of the Leading Remedies of the Materia Medica*, 1969.

৮. M. L. Tyler, *Homeopathic Drug Practices*, 2nd ed. 1952

৯. *Webster's Dictonary, Samsad Eng-Beng Dictonary.*
১০. *Science Today*, June 1981 (Letter by R. L. Jussal)
১১. Joseph Jastrow, *Error and Eccentricity in the Huan Beliefs*, Dover, N. Y. 1935.
১২. 'Man, Myth and Magic,' *Encyclopaedia of the Supernatural*, Vol. 10 (Article on Homeopathy), Marshall Cavendish Corpn. N. Y, 1970.
১৩. Martin Gardner, *Fads and Fallacies in the Name of Science.*
১৪. রাজশেখর বসু, 'ডাক্তারী ও কবিরাজী,' *পরশুরাম রচনাবলী*, ১ম খণ্ড।

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮২

দ্বিতীয় পর্যায়

বিতর্কমঞ্চ : হোমিওপ্যাথি

হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত? হ্যানিম্যানের বক্তব্যে বিজ্ঞানগ্রাহ্য কিছু আছে কি? হোমিওপ্যাথির সদৃশবিধান ও ডাইলিউশন তত্ত্ব কি, বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব দ্বারা সমর্থিত হয়? এসব প্রশ্ন আজকের নয়, বহুদিনের বিতর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে এগুলি। *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*-র পাতায় এগুলির ওপর বক্তব্য রেখেছিলেন মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (জুলাই-আগস্ট ১৯৮১)। তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করে কয়েকটি চিঠি আর হোমিও প্রসঙ্গে শ্রীমজুমদারের আরো পূর্ণাঙ্গ অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী-র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ সংখ্যায়। এর পর আবার হোমিও প্রসঙ্গে আরো অনেকগুলি চিঠি এসেছে পত্রিকার দপ্তরে। বেশ কয়েকটি চিঠি অত্যন্ত দীর্ঘ, এক একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মতো। সবগুলি চিঠি পুরো প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পুনরাবৃত্তি ও ব্যক্তিগত কিছু কটাক্ষ তথা আক্রমণ বাদ দিয়ে চিঠিগুলির মূল কিছু কিছু অংশ আমরা নিচে উদ্ধৃত করছি।

সম্পাদকমণ্ডলী, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*

রোগ সারা সম্বন্ধে হ্যানিম্যান ওষুধ সদৃশ পদ্ধতির কথা বলেছেন, লেখকের (মণীন্দ্রবাবু) মতে তা একটি hypothesis মাত্র। বিজ্ঞানের বিশুদ্ধতম শাখা পদার্থবিদ্যায় আমরা এরকম অনেক hypothesis-ই পাই। উদাহরণস্বরূপ, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভিত্তিস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের একটি hypothesis, যা কোনো পরীক্ষালব্ধ সত্য নয়। কিন্তু ঐ hypothesis কে অসাধারণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন আইনস্টাইন। সেটাই বড় কথা। নিউটনের যে তিনটি সূত্রের সাথে আমরা পরিচিত, সেগুলোও আসলে কেউ পরীক্ষা করে দেখে নি। আসলে এগুলোও hypothesis, কিন্তু এত obvious যে এদের law হিসাবেই গণ্য করা হয়।

অমিতাভ দাস

টেকনোলজি হল্, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা

তাঁর (শ্রীমজুমদারের) দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক বিজ্ঞানের মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী। ...

হোমিওপ্যাথির মূল্যায়নে শাস্ত্র ধরে অগ্রসর হওয়া একেবারেই ভুল। কোনো প্রক্রিয়ায় কোনো বিশেষ ফল দেয় কি না, তা বিচার করার একমাত্র উপায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা, controlled experiment ... সাধারণ বহুলোক অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে হোমিও চিকিৎসায় অসুখ সারছে। কবিরাজী ওষুধে অসুখ সারছে। আকুপাংচারে রোগ নিরাময় হচ্ছে। যোগব্যায়ামে শরীরের উন্নতি হচ্ছে।...শ্রী মজুমদারের অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করলে শুধু হোমিওপ্যাথি নয় (এই) সব কিছুকেই উড়িয়ে দিতে হবে। কারণ এদের সম্পর্কিত যে-সব তত্ত্ব পাওয়া যায় সেগুলি প্রায়শই আজকের দিনের বিজ্ঞানের পটভূমিকায় গ্রহণযোগ্য নয়। ...

বৈজ্ঞানিক মনোভাবের মূল লক্ষণই জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নেওয়া। ...

''দুনিয়ার অধিকাংশ লোক হোমিওপ্যাথি গ্রহণ করে নি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগ সারে না'—এই যুক্তি বৈজ্ঞানিক নয়। ...চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগতে যে ধারা বলবান একমাত্র তাকেই বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হবে, অন্য সব কিছুকেই অপমানকর উক্তি সহকারে উড়িয়ে দেওয়া হবে, এই দৃষ্টিভঙ্গি মৌলিকভাবে বিজ্ঞানবিরোধী।

অশোক রুদ্র

শান্তিনিকেতন, বীরভূম

হোমিওপ্যাথির অবৈজ্ঞানিক রূপটি সাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্য লেখককে সাধুবাদ। ৩০ ডাইলিউশন গোড়ায় নেওয়া ওষুধ (যদি) $১০^{৩৩}$ গুণ কমে যায়, (তবে) বিস্ময়ের বিষয়—কাজ হয় (যদি আদৌ হয়) তবে কিসে—ওষুধে না অ্যালকোহলে, না মনের জোরে?.....শ্রী আহমেদ এর চিঠির (এই গ্রন্থের পৃ. ১৮-১৯) ওপর বলি—শিশুর কোনো সুগঠিত মন নেই সত্য, কিন্তু তা বলে পিতামাতার মনের বিশ্বাসেও রোগ সারে না—সারে শিশুর আপন শক্তিতে বা প্রাকৃতিক কারণে। এখনও এই শহর কলকাতাতেই জলপড়া, নুনপড়া, তেলপড়া, ইত্যাদির প্রচলন আছে। এবং বেশিরভাগটাই শিশুরোগের ক্ষেত্রে। ...এতে কিন্তু ভালো হয়...এবং যে চিকিৎসায় ভালো হয় তাই বৈজ্ঞানিক— তাহলে তো জলপড়া নুনপড়া সবই বৈজ্ঞানিক। ...বিষহীন সাপের কামড়ে মৃত্যু অবৈজ্ঞানিক, সর্পদংশনাতঙ্কে (সর্পাতঙ্কের বদলে লিখলাম) মৃত্যু সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। ডা. নন্দীর (এই গ্রন্থের পৃ. ১৯-২২) সঙ্গে ...একমত হতে পারলাম না। স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন নিজের কথা ...নিজেই বলবে। ...হোমিওপ্যাথিতে কি এমন একটিও ওষুধ আছে যে নিজের কথা এইভাবে নিজে বলতে পারে?— 'ওষুধ যত কম বস্তুগত হবে তত বেশি হবে ক্ষমতা— গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের হিসাব মতো বস্তু কি আদৌ থাকে, সেন্টিসিম্যাল স্কেলে ৩০তম পোটেন্সির বেশিতে? বস্তু কম হলে ক্ষমতা বেশি হবে কিন্তু বস্তু অনুপস্থিত হলে?

শঙ্কর বিশ্বাস

কলকাতা ৭০০ ০৮৫

একটি চাঞ্চল্যকর পরীক্ষা

... আসলে হোমিওপ্যাথির যে দিকটা প্রায় শূন্য রয়ে গেছে, সেটা স্বীকার করাই ভালো, সেটা হলো ওষুধের সঠিক কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, হোমিওপ্যাথি ওষুধের সঠিক প্রয়োগে কাজ (action) হয় এবং কাজ যখন হয় তখন তার একটা mechanismও আছে, যা নিয়ে দুর্ভাগ্যবশত বিশেষ কেউ মাথা ঘামান নি। যাঁরা হোমিওপ্যাথি ওষুধের dilution বা potencyতে বিশ্বাস করেন না, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা নিজ ইচ্ছায় এবং সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে হোমিওপ্যাথিতে পরস্পর ক্ষতিকর (inimical) কিছু ওষুধের শক্তিকৃত যে কোনো মাত্রা খেয়ে দেখতে পারেন!! উচ্চমাত্রার ওষুধে তো বস্তুতপক্ষে ওষুধ কিছুই প্রায় থাকে না, কিন্তু এটা পরীক্ষিত সত্য যে inimical

ওষুধের প্রয়োগে... দেহের মধ্যে সাংঘাতিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আমি এবং কতিপয় ছাত্রছাত্রী একটা ছোট্ট পরীক্ষা করি। বর্তমানে পরীক্ষালব্ধ ফলের ভিত্তিতে গবেষণাপত্রটি কোনো একটি আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রস্তুতির পথে, তাই হুবহু data তুলে দেওয়ায় বাধা আছে। (১৯৮২-র তথ্য স.ম. বি ও বি) ..অনেকগুলো ইঁদুরকে X-ray দেওয়া হয় এবং (তাদের এক অংশকে) হোমিওপ্যাথি Arnica Mont ৩০ মাত্রার ওষুধ খাওয়ানো হয়। তাদের অস্থিমজ্জা (Bone marrow) থেকে ক্রোমোসোমের পরিবর্তন (aberration) পর্যবেক্ষণ করা হয়। ... আমাদের পরীক্ষাতে আমরা নিজেরাই অবাক হয়ে গেছি এটা দেখে যে, ঐ সামান্য মাত্রার Arnica প্রায় ১৫-২৫% aberrations protect করে! এবং শুধু Arnica প্রয়োগ করে mutagenic effect ক্রোমোজমের ওপর পড়ে না। ...বস্তুতপক্ষে এত কম ওষুধে এত বেশি মাত্রার protection পাওয়া সত্যিই একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা এবং আমরা আশা করি আমাদের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হলে বিশ্ববিজ্ঞানে একটি নতুন দিকের সূচনা হবে। —আমরা স্বীকার করছি এই protection-এর পেছনের সঠিক mechanism-এর ব্যাখ্যা আমাদেরও জানা নেই।

আনিসুর রহমান খুদাবক্স

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

যতদূর জানি অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থা একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। এর কোনো তত্ত্বগত ভিত্তি আছে বলে জানা নেই যার ফলে অনেক সময় দেখা যায়, কোনো একটা ওষুধ কয়েক বৎসর ব্যবহার করার পর তার কুফল ধরা পড়ার পর ওষুধটির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।...অপরদিকে সুষ্ঠু তত্ত্বভিত্তিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থায় কোনো একটি ওষুধ ১০০ বৎসর পূর্বে যে যে রোগলক্ষণে ব্যবহার করা হতো আজও সেই কয়েক রোগলক্ষণে ব্যবহার করা হয় এমনকি হাজার হাজার বৎসর পরেও তা একই রোগলক্ষণে ব্যবহার করা হবে... এবং এর কোনো কুফল দেখা যাবে না। আসুন না (দেখা যাক) ছোটোখাটো আলোচনার মাধ্যমে কোন্ চিকিৎসাপদ্ধতি কতটা বৈজ্ঞানিক তা নিরূপণ করা যায় কি না।

ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

পশ্চিম কোদালিয়া, নবব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা

আপনাদের জানিয়ে রাখি, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতি আজ বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাদৃত হচ্ছে (যদিও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ কখনোই চায় না হোমিওপ্যাথির উন্নতি হোক)। আপনারা দুর্মুখের গুস্তাফি মাফ করবেন কারণ 'সে' মজুমদারবাবু কিছু ভুল, কিছু স্ববিরোধী বক্তব্যকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চায়।

হোমিও চিকিৎসা কথা অর্থ কি? যদি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকেই হোমিওচিকিৎসা বলা হয়, তা কি বিজ্ঞানসম্মত?

মণীন্দ্রবাবু বলতে চেয়েছেন, 'অ্যালোপ্যাথি' শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞান। প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেছেন অ্যালোপ্যাথি হাসপাতালের জনপ্রিয়তা, ভালো ছাত্রছাত্রীর আকর্ষণ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দুর্মুখ এবার আপনাদের কিছু প্রশ্ন করতে চায়। ক. কোনো দেশে (যে দেশে ৭৫% লোক অশিক্ষিত) বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল যদি পুঁজিপতিদের সাহায্যে (ভোট পুজোর মাধ্যমে) ক্ষমতা দখল করে তাতে কি প্রমাণ হয় যে, ঐ বিশেষ দলই সঠিক বা জনপ্রিয়? পুঁজিবাদী গোষ্ঠী কখনই হোমিওপ্যাথির উন্নতি ঘটাতে রাজি নয়। খ. ভালো ছাত্রছাত্রীর আকর্ষণ? ভালো ছাত্রছাত্রীর মানে যদি এই হয় যে, ভুরি ভুরি নম্বর যোগাড় করা তাহলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আপনারা কি জানেন, এই সমস্ত তথাকথিত 'অ্যালোপ্যাথি' কলেজগুলোতে কিভাবে ছাত্র ভর্তি হয়? আর কখনই বা ভালো ছাত্র ভর্তি হয়? দুর্মুখের অনুরোধ —দয়া করে একটু জানবার চেষ্টা করুন। শ্রীমজুমদার বলছেন, 'হোমিও ওষুধে রোগীরা কেমন ভালো হয়, তার কোনো বিজ্ঞানসম্মত পরিসংখ্যানও পাওয়া যায় না।' ...কত পরিসংখ্যান কেমন ধরনের পরিসংখ্যান আপনারা চান? তাহলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন : ১ *হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া*, ২. *ন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি*, ৩. *হোমিও সমীক্ষা* প্রভৃতি।

... হোমিওপ্যাথি ওষুধ শরীরে প্রয়োগ করার পর সেই ওষুধ শরীরকে অ্যান্টিবডি তৈরির কৌশল আয়ত্ত করতে সাহায্য করে, আর এভাবেই হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েও জীবাণু, ভাইরাস, ইত্যাদি ধ্বংস করা যায়। এটা কোনো কাল্পনিক কথা নয়, পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত।

মণীন্দ্রনারায়ণবাবু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের একটিও প্রামাণ্য বই বা রচনা পান নি যেখানে হোমিওপ্যাথিকে অপজ্ঞান ও বিভ্রান্ত না বলা হয়েছে।... যে কোনো হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরিতে চলে আসুন, কত বই পড়তে চান পড়ুন তারপর সমালোচনা করুন। আরো সুবিধার জন্য জানিয়ে রাখি, Indian Journal of Homeopathy-র ১৯৮০ অগাস্ট সংখ্যা থেকে 'Scientific Basis of Homeopathy' এই শিরোনামে যে রচনাটি ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছে সেটি পড়ুন, এটি লিখেছেন Dr. R. R. Sharma (Post-graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh, Biophysics Department)।*

** চণ্ডীগড়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের বায়োফিজিক্সের অধ্যাপক আর. আর. শর্মা একজন হোমিওপ্যাথ এবং হোমিও প্রবক্তা। তিনি ১৯৭৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হোমিওপ্যাথির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে বক্তব্য রাখেন তা 'হ্যানিম্যান' গ্লিনিংস পত্রিকায় ও পরে ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ হোমিওপ্যাথি'তে (১৯৮০ জুন-নভেম্বর) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। হ্যানিম্যানের ধারণাসমূহ ও হোমিও - তত্ত্বাবলী যে আধুনিক বিজ্ঞানের নিরিখে টেকানো সম্ভব নয় তা তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাবলী যা বিজ্ঞান-বিরোধী তার অনেকটাই তিনি এড়িয়ে গেছেন। তবে তিনি বিশ্বাস করেন হোমিওপ্যাথি কাজ করে এবং তার ব্যাখ্যার জন্য তিনি পদার্থের চতুর্থ অবস্থা (Fourth State of Matter) থেকে পরা-শারীরবিদ্যা (Paraphysiology of Parapsychology) প্রভৃতি সম্ভাব্য অনেক কিছুরই কল্পনা করেছেন, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আজো নেই। শর্মাজীর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যাপার স্যাপার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে কোষের ভেতরকার স্তরে ঘটে থাকে। ('Homeopathic phenomenon seem to occur at the subcellular level via the mediation of the CNS'। শর্মাজী হোমিওপ্যাথির সাথে চিন্তা চিকিৎসা, মানসিক ও কায়িক যোগাভ্যাসকে একীভত করে দেখেন এবং হোমিওপ্যাথির সাথে রাজযোগ এমনকি অ্যালোপ্যাথিও মেলানোর সুপারিশ করেছেন। (যা হ্যানিম্যানের ধারণায় সম্ভব নয়)। বর্তমান লেখকের পক্ষে এসবকে বিজ্ঞানসম্মত বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।—ম. না. ম.*

প্রকৃতির নিয়মের ওপর ভিত্তি করেই হোমিওপ্যাথি প্রতিষ্ঠিত। হোমিওপ্যাথিকে জানতে হলে, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে জানতে হবে, ভাইটাল ফোর্স বা লাইফ্ প্রিন্সিপ্‌ল তত্ত্ব বুঝতে গেলে শক্তি সম্বন্ধে ($E=mc^2$) ধারণা রাখতে হবে, হোমিওপ্যাথির আরোগ্যনীতি বুঝতে হবে। শুধু বিরোধিতা করার জন্যই বিতর্কে অংশগ্রহণ করলে বিজ্ঞানকেই অবমাননা করা হবে। সমাজ-জীবনের বিকাশ ঘটাতে গেলে ...হোমিওদর্শন ও হোমিওবিজ্ঞান জানা একান্ত জরুরি।

শাশ্বত পাল

দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও হোমিওপ্যাথি

... সারা জগৎব্যাপী আজ যে একটি একীভূত আরোগ্যবিজ্ঞান (unified therapeutics) উদ্ভাবনের জন্য বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলির সূত্রপাত ঘটেছে তা কিন্তু অচেতন বা পরোক্ষভাবে হলেও ঐ (পত্রলেখকের পূর্বোল্লিখিত— স. ম.) Science of universal interconnection বা দ্বন্দ্ববিজ্ঞানভিত্তিক আরোগ্য বিজ্ঞান উদ্ভাবনার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। চণ্ডীগড়ের ডক্টর আর. আর. শর্মা কর্তৃক ১৯৭৭-এ প্রকাশিত *A Unified Theoretical Approach to Homoeopathy, Immunology and Rajayaoga and its Consequences* নামক প্রবন্ধটি এ-সম্বন্ধে একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। ...

হ্যানিম্যান পরীক্ষিত তত্ত্বের দ্বান্দ্বিক বা দার্শনিক ভিত্তি হলো Organon of Medicine গ্রন্থের মোট ২৯৩টি সূত্রের ১৫নং ও ১৬নং সূত্র দুটি এবং ঐ গ্রন্থের সুদীর্ঘ ভূমিকার অন্তর্গত আর একটি অনুচ্ছেদ। যে organism বা দেহমধ্যে রোগোৎপত্তি ঘটে থাকে, হ্যানিম্যান তাঁর গ্রন্থ-ভূমিকায় তাকে 'spiritual corporeal organism' হিসাবে আখ্যাত করেছেন। অর্থাৎ organism হলো তার ভরকাঠামোগত corporeal রূপ এবং তেজক্রিয়াগত spiritual-স্বরূপ—এই অবিচ্ছেদ্য দুটি বিপরীত তত্ত্বের একটি একীভূত সত্তাবিশেষ।

হ্যানিম্যান অনুগামীদের মধ্যে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ব্যক্তি হলেন জে. টি. কেন্ট। তিনি তাঁর *Lectures on Homeopathic Philosophy*-র মধ্যে *Organon*-এর সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৩ ও ১৪ নং সূত্রের ব্যাখ্যার পর ১৫নং সূত্রের পৃথক ব্যাখ্যা

ও হোমিও —তত্ত্বাবলী যে আধনিক বিজ্ঞানের নিরিখে টেকানো সম্ভব নয় তা তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাবলী যা বিজ্ঞান-বিরোধী তার অনেকটাই তিনি এড়িয়ে গেছেন। তবে তিনি বিশ্বাস করেন হোমিওপ্যাথি কাজ করে এবং তার ব্যাখ্যার জন্য তিনি পদার্থের চতুর্থ অবস্থা (Fourth State of Matter) থেকে পরা- শারীরবিদ্যা (Paraphysiology of Parapsychology) প্রভৃতি সম্ভাব্য অনেক কিছুরই কল্পনা করেছেন, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আজো নেই। শর্মাজীর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যাপার স্যাপার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রির মাধ্যমে কোষের ভেতরকার স্তরে ঘটে থাকে। ('Homeopathic phenomenon sem to occur at the subcellular level via the mediation of the CNS') । শর্মাজী হোমিওপ্যাথির সাথে চিন্তা চিকিৎসা, মানসিক ও কায়িক যোগাভ্যাসকে একীভত করে দেখেন এবং হোমিওপ্যাথির সাথে রাজযোগ এমনকি অ্যালোপ্যাথিও মেলানোর সুপারিশ করেছেন (যা হ্যানিম্যানের ধারণায় সম্ভব নয়)। বর্তমান লেখকের পক্ষে এসবকে বিজ্ঞানসম্মত বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।—ম. না. ম.

না দিয়ে ঐ ১৪নং সূত্র মধ্যেই কোনোরকমে দু-একটি কথা বলে ছেড়ে দিয়েছেন, দেহ ও প্রাণশক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কগত (১৫নং সূত্রের) দ্বান্দ্বিক তাৎপর্যের ধারে কাছেও যান নি। ১৬নং সূত্র সম্বন্ধে তাঁর যে ব্যাখ্যা তাও হ্যানিম্যানের বস্তু-তথ্যভিত্তিক আলোচনার ধারে কাছে যায় নি। তাঁর যে ব্যাখ্যা তাও হ্যানিম্যানের বস্তু-তথ্যভিত্তিক আলোচনার ধারে কাছে যায় নি। তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি হ্যানিম্যানের 'Spirit like power' যেভাবে তাঁর নিজস্ব 'simple substance' এর তত্ত্ব দিয়ে সম্পূর্ণভাবে গ্রস্ত বা আচ্ছন্ন রেখে ঐশ্বরিক শক্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শন করেছেন, তাতে বক্তৃতাটিকে 'Kent's philosophy on Homoeopathy' বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত।...

হ্যানিম্যান জীবনীশক্তিকে কোথাও vital force, কোথাও vital energy কোথাও আবার vital principle বলে উল্লেখ করেছেন।

...তিনি যখন এই energy কথাটি ব্যবহার করেছেন তখন mass conversion into energy কিংবা energy conversion into mass এ-ব্যাপারগুলি মানুষের পক্ষে প্রায় একেবারেই অকল্পনীয় ছিল। তবুও এক অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি এই energy কে একেবারে নিঃসন্দেহে ঈশ্বরসংশ্লিষ্ট 'spirit like এর পরেও বন্ধনীবদ্ধ dynamic বা conceptual। আর আমরা আগেই দেখেছি, তার Orgainsin সম্বন্ধীয় concept এর মধ্যে spirituality এবং corporeality অর্থাৎ energy dominant something একেবারে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে প্রায় একশ বছর আগেই dialectic of matter or nature তাঁর মানস নেত্রে প্রতিফলিত হতে চেয়েছে।..

কোনো ওষুধ বা রাসায়নিক স্থূলভাব অনুভূত ভৌত প্রণালীতে বিক্রিয়া ঘটাতে না পারলে যে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য তা বোধ হয় ঠিক নয়। অর্থাৎ এক বিশেষ পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা সমর্থিত না হলেও তার সমর্থন সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয় না। ... (এইভাবে) হ্যানিম্যানের ধারণা দ্বন্দ্বতত্ত্বনির্ভর সুতরাং বৈজ্ঞানিক না বলে উপায় থাকে না।...

রবি মাইতি

ইনস্টিটিউট ফর ডায়লেকটিক্যাল স্টাডিজ, চুঁচুড়া

... আমাদের ১ থেকে ২৯৪ পর্যন্ত সূত্র আছে, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে ধরা যায় না, ... প্রতিটি সূত্রের সাথে একটা সংযোগ আছে, সেই কারণে মাঝখান থেকে একটা সূত্র তুলে হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানসম্মত কি না বা কতটুকু বিজ্ঞানসম্মত বোঝাতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। Nosode group of Medicine-এর pathogenic property থাকে বলে তারা antibody-ও দেহে তৈরি করতে পারে। এটা ইমিউনোলজিকে ছাড়িয়ে যায় নি। হোমিওপ্যাথ হিসেবে বলতে পারি যে, আমরা ১. রোগ সারাতে পারি, ২. রোগ প্রতিরোধ করতে পারি এবং ৩. রোগের উপশম করতে পারি। যে চিকিৎসা বিধানে এই তিনটি সম্ভব সেটি যথার্থ চিকিৎসাবিজ্ঞান নয় কি?...

... বাস্তব প্রয়োগে হোমিওপ্যাথির সাফল্যের অনেক ঘটনার মধ্যে দুটি তুলে ধরছি।
ক. একজন রোগী কলকাতা মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগে চিকিৎসার জন্য যায় এবং Septal disorder of heart ধরা পড়ে এবং রোগীকে ভেলোর পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তিনমাস পর দিন ধার্য হয়। ইতিমধ্যে রোগী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতে যায় এবং কিছুদিন পর সেই কলেজেরই ডাক্তার বলেন যে, রোগীর ভেলোর যাবার প্রয়োজন নেই।
খ. সেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছেই একজন রোগী ব্রেন-টিউমার নিয়ে যায় X-ray report সহ। টিউমারটি ডানদিকে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারে ছিল এবং কিছুদিন চিকিৎসা করার পর পুনরায় X-ray রিপোর্টে টিউমারটির আর কোনো অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। (সংশয় থাকলে আমরা সব তথ্য তুলে ধরতে সক্ষম) ...হ্যানিম্যান দেহ ও আত্মার কথা বলেন নি, তার আলোচনা সূত্র ৯-এ হ্যানিম্যান বিশদভাবেই বলেছেন। সাইকোসোমাটিক ব্যাপারটায় কারো যদি পরিষ্কারভাবে ধারণা না থাকে তাহলে কিছু বলবার নেই। কারণ হোমিওপ্যাথিতে মানসিক এবং দৈহিক সমতাকেই স্বাস্থ্য বলা হয়েছে এবং এই শাস্ত্রে মনের ব্যাপারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, কারণ দৈহিক লক্ষণ মনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়...

বিপরীত বিধানে রোগ সারে না এটা বুঝে নেওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার, কারণ নিউটন বলেছেন, 'Every action has its equal and opposite reaction.' Similia similibus cuarentur বলতে গিয়ে Isopathy-র সাথে কেউ যদি হোমিওপ্যাথিকে গুলিয়ে ফেলেন তাহলে কিছু বলবার নেই। হ্যানিম্যান অর্গানন-এর কোথাও বলেন নি যে, পুড়ে গেলে আগুন লাগাতে হবে বা ধুতরা যেহেতু উন্মাদ সৃষ্টি করতে পারে সুতরাং উন্মাদ মানেই Stramonium (ধুতরা থেকে তৈরি ওষুধ)। ... বস্তুকে কতদূর পর্যন্ত ভাঙা যায়, তার কোনো সীমারেখা টেনে দেওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং যতই ডাইল্যুশন করা হোক না কেন এটা বলা যাবে না যে, তাতে কিছু নেই বা তার মধ্যে কোনো শক্তি বা বস্তুর অস্তিত্ব নেই। — complete ionization and absolute dissociation are possible only in infinite dilution এবং dilute করা ওষুধ যে রোগীর রোগ দূর করে তা বাস্তবে প্রমাণিত, হাজার হাজার হোমিওপ্যাথদের দ্বারা।

Magnetis polus arcticus বা Sanicula ইত্যাদি ওষুধগুলি মজাদার ব্যাপার নিশ্চয়ই তবে অবৈজ্ঞানিক কিছু নয়। কারণ এগুলি প্রত্যেকটি ওষুধ ...পৃথক লক্ষণসমষ্টি সুস্থ দেহে দিয়ে থাকে ...ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতিতে হ্যানিম্যানের বিশ্বাস ছিল বলে তত্ত্ব কখনো অবৈজ্ঞানিক হয় না। তাহলে স্যার আইজাক নিউটন-কেও তাই বলতে হয়।... বর্তমান বিজ্ঞান ব্যাখ্যা দিতে পারছে না বলে তাকে অস্বীকার করতে পারি না কারণ রোগীর ক্ষেত্রে তা দেখতে পাচ্ছি।

অমলকুমার ভট্টাচার্য ও রঞ্জিত শূর

১৫১, ডায়মন্ডহারবার রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৪

অধ্যাপক Traube-র (১৯২৫) সূত্র ধরিয়া বলিতে পারি... ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া বস্তুর কলয়েড অবস্থানজনিত গুণের উপর নির্ভরশীল। —(এই) অবস্থায় বস্তু ঋণাত্মক অথবা ধনাত্মক অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। তিনি (Traube)

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ অবস্থায় বস্তু জৈব বিদ্যুৎ প্রভব (Bioelectrical potential) হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া জৈব প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন সাধন করিতে পারে।...

'সেন্টেসিম্যাল স্কেলে হ্যানিম্যান ৩০ ডাইলিউশন পর্যন্ত গিয়েছেন। গোড়ায় নেওয়া ঔষধ এই পর্যায়ে $১০^{৬০}$ গুণ কমে যায়' —তাঁহার (শ্রী মজুমদারের) হিসাব ভ্রান্ত। ৩০ শক্তির হোমিওপ্যাথিক ঔষধে গুণোত্তর শ্রেণীর সূত্র প্রয়োগ করিয়া দেখানো যায় যে ঐ শক্তিতে মাত্র এক গ্রেনের $১০^{৬০}$ অংশ পরিমাণ ঔষধদ্রব্য বর্তমান থাকা উচিত...। ... নির্বিচারে গুণোত্তর শ্রেণীর প্রয়োগ অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প লঙ্ঘনের অমূলক... দোষারোপের শিকার হইয়াছে।

লেখক স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে একটি সংবিভাগ সূত্র সৃষ্টি করিয়াছেন (যাহা হইতে প্রমাণ করা যায় যে) ওষুধের শক্তিক্রিয়তা যে কোনো পরিমাণ ঊর্ধ্বে আনয়ন করা হউক না কেন সেই ঔষধে ঔষধদ্রব্যের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিশ্চিত ...।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিবার মূল ক্রিয়া এইরূপ। পর্যায়ক্রমে ঔষধের শক্তিক্রিয়তা বৃদ্ধি করিতে ঔষধদ্রব্যের লঘুতা দশমিক মাত্রায় $\frac{১}{১০}$, শতমিক মাত্রায় $\frac{১}{১০০}$ এবং মিনিসিমেল মাত্রায় $\frac{১}{৫০,০০০}$ ... এই অনুপাতে করিতে হইবে এবং প্রতি পর্যায়ে নির্দিষ্ট সংখ্যা করার তরল মাধ্যম সমেত ঔষধদ্রব্যকে ঝাঁকাইতে হইবে।...ঝাঁকুনি কোনো চিকিৎসাশাস্ত্রে ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর একটি বিশেষ অঙ্গ—ইহা হয়ত অনেকের নিকটই দুর্জ্ঞেয় বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু Rudolph B Smith M.T. এবং Garth W Boericke, M. D. (Journal of American Inst. Hom, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৯১০, ১৯৬৭ পৃ. ২৫৯-৭২) LiCL-এর বিভিন্ন অ্যালকোহলীয় দ্রবণের (৬ × হইতে ৩০ × পর্যন্ত) NMR (Nuclear Magnetic Resonance) দ্বারা দেখাইয়াছেন যে (ঝাঁকুনিযুক্ত) পোটেন্সির অনুনাদি লেখচিত্রের ক্ষেত্রফল, সরল দ্রবণের ক্ষেত্রফল হইতে বেশি।...

জ্যোৎস্নাময় মুখার্জী

পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলকাতা ৭০০ ০০৯

কয়েকটা দুর্বল যুক্তির প্রতিবাদ জানাতে চাই। হোমিওপ্যাথির মূল দৃষ্টিকোণ এম্পিরিক্যাল এতে বিভাসবাবুর আপত্তি কেন? এম্পিরিক্যাল-এর অর্থ বিজ্ঞান বিরোধী নয়, উপরন্তু একমাত্র এম্পিরিকাল পরীক্ষাই বলে দিতে পারে হোমিওপ্যাথি ধোঁকা কি না।

...আমি নিজে হোমিও চিকিৎসায় প্রচণ্ড সুফল পেয়েছি। লঘু ও তেজীকরণের ব্যাপার নিয়ে একটা Wild guess করেছিলাম। আর্সেনিককে যখন ৯৯ গুণ মিল্ক অফ সুগারের সঙ্গে ঘষা হয় তখন এমন হওয়া কি সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, মিল্ক অফ সুগারে উপস্থিত জীবাণুর মধ্যে আর্সেনিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়। এইভাবে চলে। ঐ ওষুধ মানুষের দেহে গেলে ঐ R-factor মানুষের দেহের প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে দেয়...

অথবা এমনও হতে পারে যে, মিল্ক অফ সুগারের ক্রিস্টাল গঠনে আর্সেনিকের বৈশিষ্ট্যদ্যোতক পরিবর্তন ঘটে— হতে পারে।...

কল্যাণ দেব

রামমোহন কলেজ, খানাকুল, হুগলী

একটিতে পাই কার্যকারণ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণার ওপর আস্থা, আর অন্যটিতে (**হোমিওপ্যাথিতে**) পাই বেশি জানার চেষ্টা থেকে বিরত থাকার উপদেশ 'there are things the human hand has not grasped human eye not yet seen, the human mind, yet not comprehended–perhaps we shall never palpate these essential life forces.' (p. 148, *The Homoeopathic Principle in Therapeutics*, T. H. Mc Gavack, Head of the Dept of Homoeopathy. Univ. of California Medical School) দ্বিতীয় মতটি নিশ্চয়ই অবৈজ্ঞানিক।

...এই অবৈজ্ঞানিক মতবাদের ছত্রছায়ায় নানা আজগুবি তত্ত্বের ছত্রাক লালিত পালিত হয়েছে।...এই আলোচনার বর্শামুখ শুধু Dilution theory-র ওপর রাখা হচ্ছে।

Dilution তত্ত্বের ওপর Homoeopathic circle-এ নানা মুনির নানা মত। এই বর্ণালীর কিছু আভাষ দেওয়া যাক—

Krakow (১৯২২) দেখিয়েছেন যে অ্যাড্রিনালিন, মার্কারি বাই-ক্লোরাইড, কপার সালফেট ২৪ x-এ কাজ করে, সিলভার নাইট্রেট, হিস্টামিন ৩২-x-এও কাজ করে। Kolisco দেখেছেন, লোহা ও তামার সল্ট গমের Germ-এর ওপর ৩০ x-এ কাজ করতে পারে— এসব ব্যাপারে McGavack মন্তব্য করেছেন যে ওপরের dilutionগুলো খুবই সন্দেহজনক, কারণ...একটা কাঁচের পাত্রে $\frac{১}{১০০}$ মেথিলিন ব্লুকে ২০০ x ডাইলিউশন করলে এবং ঐ কাঁচের পাত্রে solution-এ যাবে তাই Theoretical dilution ২০০ x হলেও actual dilution হবে ৪ x বা ৫x। তাই extreme dilution এও (এই) oligodynamic effect-এর জন্য কিছু পদার্থ থেকে যায়।

...এবার ভারতীয় হোমিওপ্যাথি Dr. Bihari কি বলেন দেখা যাক। 'Homeopaths have found out that in the actual practice the real molecules are different from the cenceived physicists molecules (Unfathomed Regions of Homoeopathy, পৃ.৪৪)—যুক্তির লাগাম ছাড়া ঘোড়া ছুটেছে—বিবি ছাড়া আমরাও একটু সরে দাঁড়াই, দেখি কি হয়।

কিছু হোমিওপ্যাথ dilution-এর তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে আইনস্টাইনের $E=mc^2$ টেনে আনেন ...Higher dilution ...নাকি mass energyতে converted হয়। mass যে energyতে converted হয় তা আমরা জানি—এই conversion আমরা প্রত্যক্ষ করি chemical combustion-এর বেলায় কিন্তু dilution করার মধ্যে তো আমরা এমন কিছু process প্রত্যক্ষ করি না... তাই হোমিওপ্যাথদের এই প্রচেষ্টাও 'ছায়া ধরার ব্যবসা' হয়ে রইল।

...Dr. D. S. Rawson (British Homeopathic Journal, April. 1972) potentised ওষুধের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে Semiconductor Theory-র শরণাপন্ন হয়েছেন।

...কিন্তু পদার্থবিদ্যায় সেমিকন্ডাকটর তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা আছে ...potentised drug-এ stored energy (Rawson-এর ভাষ্য অনুযায়ী) কোথা থেকে আসে? তার physico-chemical ব্যাখ্যা কি?

...তত্ত্বে এই গরমিলের প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই পড়ে প্র্যাকটিসকারী হোমিওপ্যাথদের dilution এর প্রতিবিধানে। যেমন—ডা. হ্যানিম্যানের মতে— ঠিক ওষুধ হলে তা যে কোনো

পোটেন্সিতে কাজ করবে। Dr. Van dar Goltz কিন্তু low potency-র যথার্থতা সম্বন্ধে একমত নন। Dr. Wheeler...higher potency দিয়েই আরো ভালো করে সারানো যায়, তবে কিছু জায়গায় low potency কাজ করে।... Dr. Elin Barkar — পোটেন্সি পরিবর্তিত করে যেতে হবে ৯ × থেকে ১২ × তারপর আবার ৩০ × থেকে ১২ × এবং ৬ ×, তারপর ৩০×, তারপর ২০০। Dr. Vandar Goltz—অ্যাজমাতে ২০০তম থেকে ১০০০তম single dose দিলে আরোগ্য হয়।

সুদর্শন চক্রবর্তী

টেলিফোন ভবন, সপ্তম তল, কলকাতা ৭০০ ০০১

Only antigens are not sufficient to produce disease। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না vital force weak হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ antigen-এর introduction কিছু করতে পারছে না। তাই যথার্থভাবেই হ্যানিম্যান বলেছেন, কোনো বস্তু (বিভিন্ন ধরনের antigen) কোনো কটুতা, অসুখ ঘটানোর কোনো জিনিসে কোনো মানুষের অসুখ হয় না।

ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করে অবৈজ্ঞানিক কিছু তো পেলাম না। তাহলে ব্যঙ্গ করে (হ্যানিম্যানের) এ-উদ্ধৃতি দেওয়ার কি অর্থ হয়?

টি. আহমেদ

বি আই টি এম, কলকাতা

বিজ্ঞান বিজ্ঞানকর্মী, মে-জুন, ১৯৮২

নেচারের আত্মবিশ্লেষণ

নেচার পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে বেনভেনিস্তেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে বিতর্ক চলছিল তার অবসান ঘটিয়ে নেচারের ২৭ অক্টোবর ১৯৮৮ সংখ্যায় বেনভেনিস্তের এক পৃষ্ঠার বক্তব্য এবং নেচারের সম্পাদক ম্যাডক্সের চার পৃষ্ঠার জবাবি বক্তব্য ছাপা হয়েছে।

বেনভেনিস্তের লেখায় কেবল ধানাইপানাই...। তিনি নেচারের তদন্তকারী দলকে "fraud squad" আখ্যা দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, পাঁচ পাঁচটা ল্যাবরেটরি একইসাথে ধোঁকা দিচ্ছে? তাঁর মূল বক্তব্য, তাঁরাই সঠিক এবং, এখনই ব্যাপারটা মিটে যাচ্ছে না।

নেচারের সম্পাদকের সুদীর্ঘ জবাবি লেখার সিংহভাগ জুড়ে নিজেরই তোলা প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উত্তর এড়িয়ে গিয়ে সুকৌশলে অস্পষ্ট অপ্রাসঙ্গিক কথার ফুলঝুরি ফোটানো হয়েছে।

বেনভেনিস্তেদের গবেষণাপত্র নেচার কেন আদৌ ছাপল, এ প্রশ্নের উত্তরে আধপৃষ্ঠা জুড়ে যা বলা হয়েছে তার মোদ্দা কথা হলো : একটা যুগান্তকারী আবিষ্কারকে চেপে দেয়া হচ্ছে—এরকম অভিযোগ এড়াতেই গবেষণাপত্রটি ছাপা হয়েছে।

আগে তদন্ত করে পরে ছাপা হলো না কেন, এর উত্তরে স্পষ্টভাবে কিছুই বলা হয়নি। তবে সম্পাদকের মনে হয়েছিল, ল্যাবরেটরিতে কোনোরকম ফাঁকিবাজি বা ছলনার আশ্রয় নিয়ে হয়ত পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করা হয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আগে ফলাফল ছেপে পরে ফাঁকিটা ধরা যেতে পারে।

বেনভেনিস্তের দল পরিকল্পনামাফিক ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছে বলে অবশ্য ম্যাডক্স মনে করেন না। তাঁর ধারণা, বেনভেনিস্তেদের কাজকর্ম হেলাফেরা করে (carelessly) করা বিজ্ঞানের নমুনা। পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করা হয়েছে অসতর্কভাবে, ফলাফলের ব্যাখ্যাও করা হয়েছে হেলাফেলা করে। বেনভেনিস্তেরা স্যামপ্লিং এর (sampling errors) সম্পর্কে ঠিকমতো ওয়াকিবহাল না থেকে পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাছাড়া পর্যবেক্ষকের পক্ষপাতিত্ব (observer bias) সংগৃহীত তথ্যের ক্ষতি করেছে।

ম্যাডক্স লিখেছেন, "পুরো ব্যাপারটা কি কোনো কাজে এসেছে?" এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, 'না'। অনেক লোককে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে, বিশেষ করে INSERM 200এ [বেনভেনিস্তের ল্যাবরেটরি], আর এইসব কসরতেই অনেক সময় কেটে গেছে, যে সময়টাতে অন্য কোনো ভালো কাজকর্ম করা যেত।"

ম্যাডক্সের লেখার উপসংহার পড়ার মতো :

"[গবেষণাপত্র] বিচারের পদ্ধতিতে যে গলদ থাকতে পারে (the fallibility of the refereeing process) সে বিষয়ে নেচার অনেক কিছু শিক্ষা পেল। তার মানে এই নয় যে প্রচণ্ড লঘু দ্রবণের এই ব্যাপারে বিচারকেরা সুযোগ্য ছিলেন না। বিতণ্ডায় না গিয়ে বলা যায়, এমন অনেক পরিস্থিতি আসে যখন পাণ্ডুলিপি আর পেশ করা আনুষঙ্গিক কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখে বলা মুশকিল, যা দাবি করা হচ্ছে তা অকাট্য (valid) কিনা। এর মানে এই নয় যে বিচারের পদ্ধতিটা সবসময়েই এরকম অনির্ভরযোগ্য, কিম্বা এও নয় যে এর পুরোটাই ফাঁকে ভরা। বরং এমন অবস্থা আসেই যখন ছাপা হবে কি হবে না এরকম সিদ্ধান্ত বিষয়ীনির্ভর (subjective) হতে বাধ্য। যাঁরা সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের কাছে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু, জার্নালে যাই বেরোয় তা'ই সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি, এই অতিকথা (myth) – খুব অল্প লোকের কাছে হয়ে থাকলেও—মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে।

"তা সত্ত্বেও এই লঘু দ্রবণের বিষয়টাতে অস্বস্তিকর যেসব ব্যাপার চোখে পড়ে তাদের একটা হলো, জনমানসে নেচার যেন পরম সত্যবাদিতার বিশ্বাসের খুঁটির সঙ্গে গেঁথে গেছে। গত কয়েক মাসে সাধারণ সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিক্রিয়া অন্তত খানিকটা হলেও এ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। সংবাদমাধ্যমগুলোর আগ্রহ ছিল তীব্র কিন্তু ওপর-ওপর (intense but superficial)। একবার আমার মনে হয়েছিল, ডঃ বেনভেনিস্তের মনে করিয়ে দেয়া প্রশ্নগুলোই যেন এক সাংবাদিক আমাকে করে যাচ্ছেন। দুঃখের কথা এই যে, সত্যের রঙ হয় সাদা নয় কালো এই ধারণা মিলিয়ে যেতে বড় দেরি হচ্ছে।

"গবেষকমহলের সমালোচকদের উদ্দেশ্যগুলো (motives) ছিল একেবারেই অন্যরকম। যেসব উপায়ে গবেষণার পেশায় গুণগত মান নির্ধারিত হয় এবং বজায় থাকে, প্রকাশনা তাদের মধ্যে একটা প্রধান উপায় হিসেবে গণ্য হয়। প্রফেশনাল সোসাইটিগুলোর এবং অ্যাকাডেমিকস মহলের সঙ্গে কোনোরকম প্রথাগত সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও কিন্তু নেচার এই

প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, পাঠকদের সাধারণ জ্ঞানালোকসম্পাতে, ছাড়পত্র অর্জন করেছে ঐতিহ্যগতভাবে। একটা উপলব্ধি এই যে, এই স্বাধীনতার জন্যে যে দাম দিতে হয় তার একটা অংশে হলো নতুন কিছু চালু করার ঝুঁকি নেয়া। তা নেয়া হয় বলেই নেচারকে কখনো কখনো বেহিসেবি আচরণ করতে দেখা যায়। কিন্তু যা অনেকের কাছে মাননির্ধারক প্রক্রিয়ার বিচারে প্রহসন বলে মনে হয়েছিল, তা অন্যদিক থেকেই যত শিক্ষাপ্রদ হোক না কেন, সচরাচর দেখা যায়না এমন সব আবেগের জন্ম দিতে বাধ্য। সব মিলে, গত কয়েকমাসে যা সব ঘটল, তা নিয়মিতভাবে বারবার ঘটার সম্ভাবনা নেই।

"... INSERM 200-এর [বেনভেনিস্তের ল্যাবরেটরি] অতিলঘু অ্যান্টি-IgE সংক্রান্ত দাবির সত্যতা কতটা? একজন পত্রলেখক আমাদের এই বলে ভর্ৎসনা করেছেন যে, আমরা নাকি প্রকৃত ব্যথা আবিষ্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করেছি। আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা আবিষ্কার নিয়ে এত কথা, সেই ব্যাপারটা (phenomenon) যে আদৌ ঘটে, সেটা দেখানোই এখনও বাকি।"

সুদীপ্ত সরস্বতী

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত সেমিনারের রিপোর্ট

৫ জুন ১৯৮২ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা এবং ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল গ্র্যাজুয়েটস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী ভবনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোকে হোমিওপ্যাথি বিষয়ক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডা. বকুল ভাদুড়ি।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডা. এইচ. কে. বিশ্বাস বলেন যে, নিজের এবং পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতায় প্রকৃতির নিয়মকে লক্ষ্য করেই হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির ভিত্তি স্থাপন করেন। কাজ হয় কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবী চান। আশিস সিংহ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হোমিওপ্যাথির ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, vital force বলতে হ্যানিম্যান বুঝিয়েছেন জড়কেই। বিজ্ঞানের দর্শনের দিক থেকে দেখলে হোমিওপ্যাথিই একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি। ডা. এ. সি. দত্ত বক্তব্য রাখেন স্লাইড সহ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে হোমিওপ্যাথিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হলেও, সমাজতান্ত্রিক শিবির একে বর্জন করেছে—তিনি বলেন। নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষার জন্য মানুষের বদলে জীবজন্তু অথবা গাছপালার ওপর পরীক্ষা চালানো প্রয়োজন।

ডাবল ব্লাইন্ড পরীক্ষার সাহায্যে সমস্ত ওষুধকে যাচাই করার কথা বলেন ডা. জ্ঞান শীল। এরপর ডা. মণীন্দ্রনারায়াণ মজুমদার বলেন, বিজ্ঞান গড়ে ওঠে বহুলোকের প্রচেষ্টায়, অথচ হোমিওপ্যাথি, হ্যানিম্যান নামক একজন মাত্র লোকের আবিষ্কার। হ্যানিম্যানের *অর্গানন* আজ পুরোপুরি অচল। ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া পরিত্যাগ করেছে এ চিকিৎসা পদ্ধতি। সংযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখেন ড. মজুমদার। বক্তব্য রাখতে উঠে ডা. ললিত খাঁড়া তাঁর চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ তোলেন—আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে দুরারোগ্য কোনো রোগ হোমিওপ্যাথিতে নিরাময় হয়েছে এমন কোনো উদাহরণ তাঁর জানা নেই। ওষুধকে পরীক্ষা করার ব্যাপারে তিনি তিনটি গ্রুপে ভাগ করার কথা বলেন—বিনা ওষুধে আরোগ্য, ওষুধ দিয়ে আরোগ্য আর Placebo দিয়ে কাজ হয়, যেমন হোমিওপ্যাথিতে হয়। ডা. স্মরজিৎ জানা বলেন, রোগের কারণ জানা দরকার, কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে তা করা হয় না। চিকিৎসার এই পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত কি না, এ বিতর্ক বহু পুরোনো, এ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। বরং সামাজিক দিক থেকে সমগ্র হোমিওপ্যাথিকে ধরে আলোচনা দরকার।

আলোচনাচক্রের শেষে ডা. জ্ঞানব্রত শীল ও ডা. মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার প্রস্তাব রাখেন, হোমিওপ্যাথি ও অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করে একটি সংযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করার সম্ভাবনা বিচারের জন্য একটি কমিটি গঠন করার ব্যাপারে আবেদন করা হোক সরকারের কাছে। সভায় উপস্থিত হোমিওপ্যাথরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন—সারা ভারতের হোমিওপ্যাথদের তরফ থেকে তাঁরা এই বিরোধিতা করছেন। সভায়

দেখা যায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। সভাপতি যথেষ্ট চেষ্টা করেন তাঁদের বোঝানোর। কিন্তু তাঁরা নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকেন। এইরকম অচলাবস্থায় প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন ডা. জ্ঞানব্রত শীল। আলোচনাচক্র শেষ হয় এখানেই।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, জুলাই-আগস্ট, ১৯৮২

সম্পাদকীয় বক্তব্য

এক, 'অ্যালোপ্যাথি' বা 'হোমিওপ্যাথি' বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট 'প্যাথির' শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ নয়, একটি একীভূত চিকিৎসা বিজ্ঞান (unified medical science)-এর লক্ষ্যে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করতে হবে। এই একীভূত চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপাদান কি কি হবে সেটি নির্ধারণ করাই হবে আমাদের লক্ষ্য।

দুই, সমস্ত আলোচনা ও বিতর্কের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসাবে নিতে হবে *বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির* প্রশ্নটিকে। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান করে *যাচাই করা যায়* এমন ধরনের *পরীক্ষা নিরীক্ষা* এবং *তত্ত্বগত বিশ্লেষণ*—এই দুয়ের পরস্পর পরিপূরক সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই দুটির কোনো একটি বাদ দিয়ে যে ব্যবস্থাই গড়ে উঠুক না কেন তা অবৈজ্ঞানিক। তবে অবৈজ্ঞানিক মানেই সম্পূর্ণ বর্জনীয় নয়। তার ভেতর থেকে গ্রহণীয় উপাদানগুলিকে সনাক্ত করা প্রয়োজন।

তিন, 'হোমিওপ্যাথি কাজ করে,' বহুসংখ্যক মানুষের এই অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসকে উড়িয়ে দেওয়ার যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু শুধুমাত্র এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে হোমিওপ্যাথির প্রয়োগ সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। ঠিক কোন্ কোন্ ওষুধ কোন্ কোন্ অসুখে বা অবস্থায় কি ধরনের কাজ করে সে-সম্পর্কে পরীক্ষালব্ধ বিশদ *তথ্যাদি* প্রয়োজন ও তা বারংবার যাচাই হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ব্যবহারের স্তরে লব্ধ অভিজ্ঞতা যতই ব্যাপক হোক না কেন তা একটি প্রাথমিক দিক নির্দেশের বেশি আর কিছুই দিতে পারে না।

চার, বৈজ্ঞানিক পক্রিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি ওষুধগুলি কেন কাজ করে সে সংক্রান্ত তত্ত্বগত বিচার বিশ্লেষণ অপরিহার্য। পর্যবেক্ষণ যতই বিশদ ও ব্যাপক হোক না কেন, সঠিক তত্ত্ব ছাড়া তার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও চিকিৎসা পদ্ধতির ক্রমিক উন্নতি কোনোমতেই সম্ভব নয়।

পাঁচ, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও নিয়মাবলী এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম হতে পারে না। যেমন অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প এক ক্ষেত্রে খাটবে আর এক ক্ষেত্রে খাটবে না এমন হওয়া সম্ভব নয়। যদি দেখা যায় এমন হচ্ছে তবে বুঝতে হবে হয় পর্যবেক্ষণে ভুল আছে আর না হয় অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পকে আরো উপযুক্ত কোনো সূত্র দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পর সঙ্গতিহীন নিয়মাবলীর অস্তিত্ব স্বীকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়।

ছয়, তত্ত্বগত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি *সম্ভাবনা* চিহ্নিত করা বা বৈজ্ঞানিক অর্থসম্বলিত কয়েকটি বক্তব্য আলগাভাবে উপস্থিত করার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কিছু সম্ভাবনা চিহ্নিত করা থেকে একটি তত্ত্বগত বিশ্লেষণ শুরু হতে পারে মাত্র, কিন্তু শুধু সম্ভাবনা চিহ্নিত করা থেকে একটি তত্ত্বগত বিশ্লেষণ বা তার একটি ধাপ বলে ধরে নিলে চলবে না। ভর ও শক্তির সমতুল্যতা বা $E=mc^2$ সূত্রটি হোমিওপ্যাথিতে প্রযোজ্য হতে পারে শুধু এ-কথা বললে তা হোমিওপ্যাথিতে তত্ত্বগত বিশ্লেষণে বিন্দুমাত্র সাহায্য করবে না। E=mc2

একটি বিশদ তত্ত্বগত কাঠামোর অঙ্গ। প্রচুর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে এই কাঠামোটি তৈরি। হোমিওপ্যাথির সঙ্গে এই কাঠামোটি কিভাবে সম্পর্কিত হতে পারে সে সম্ভাবনাটি চিহ্নিত না করলে শুধু $E=mc^2$ সূত্রটি উল্লেখ করা আর কোনো একটি তান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ করা একই ব্যাপার। বিপরীত বিধানের অসারতা বোঝাতে সূত্রগুলিকে তৃতীয় সূত্রের উল্লেখ অথবা নিউটনের obvious hypothesis বলা এগুলিও এমনই আল্‌গা বক্তব্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি অবাস্তব, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ভুলও।

সাত, আজ যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না, কাল তার ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে, অথবা ব্যাখ্যা না পেলেই কোনো কিছু বর্জনীয় হয়ে যায় না এই সঠিক বক্তব্য থেকে, আজ যার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না সে-রকম সবকিছুকে স্বীকৃতি দেওয়াটাও আবার বিপরীত ধরনের ভ্রান্ত মানসিকতা। সঠিক পর্যবেক্ষণ ও সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই থাকে কোনো পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতির একমাত্র গ্যারান্টি।

হোমিওপ্যাথির ভেতর যদি কিছু গ্রহণযোগ্য থাকে তবে সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তা সনাক্ত করার ও একীভূত চিকিৎসা বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত করার প্রক্রিয়া যত ত্বরান্বিত করা যায় ততই মঙ্গল।

সম্পাদকমণ্ডলী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, মে-জুন, ১৯৮২

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

একটি নিবেদন/একটি প্রস্তাব

প্রসঙ্গ ।। ক্যানসারের ওষুধ

রোগের বিরুদ্ধে যে কোনো কার্যকরী হাতিয়ারের সন্ধানে দ্বিধাহীনভাবে আত্মনিয়োগ করা প্রতিটি বিজ্ঞান-সচেতন মানুষের কর্তব্য। সেটা সম্ভব একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। নীচের এই চিঠিটি সেই বেজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার স্বার্থেই প্রকাশিত হল। যাঁরা এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা ও চর্চা করছেন, তাঁরা যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে এটি পর্যালোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। **স. উ.**

আমি গত ৩ বৎসর যাবৎ বায়োকেমিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা ক্যান্সার চিকিৎসায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করতে চাই।

(১) . তিন বৎসর পূর্বে মিসেস দাসের বুকের ক্যান্সার-আক্রান্ত অংশটি শল্য চিকিৎসায় অপসারণের পর অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে এবং একমাস নানা ঔষধ প্রয়োগে কোনো উপকার হয়নি। তখন আমি রোগিণীকে প্রত্যহ সকালে ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর ৬x ও সন্ধ্যায় ক্যালি-ফস ৬x' এর ৫টি করে ট্যাবলেট খেতে বলি। এতে তিনি যন্ত্রণামুক্ত হন ও শীঘ্র সুস্থ হন।

(২) ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯তে আমার এক আত্মীয়া S. S. K. M. হাসপাতালে E.N.T. বিভাগে ৪ তলায় ৪৪নং বেডে ভর্তি হন। তাঁর ডান চোখ থেকে গলা পর্যন্ত ক্যান্সারে আক্রান্ত। ৬ মার্চ ডাঃ এস. এন. মুখার্জির তত্ত্বাবধানে গলার কাছে ক্যান্সার আক্রান্ত অংশটি অপসারণ করা হয় এবং বাকী অংশ পরে অপসারণ করা হবে বলে স্থির হয়। এরপর তাঁকে প্রত্যহ ৫টি করে ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর ৬x ট্যাবলেট দেওয়া হয়। এতে তাঁর ক্যান্সার আক্রান্ত অংশটি মিলিয়ে যায়। সুস্থ হওয়ায় মে মাসে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বার্ধক্যজনিত কারণে ৬৮ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ক্ষুধাহীনতা ছাড়া মৃত্যুকালে তাঁর কোনো কষ্ট বা যন্ত্রণা ছিল না।

(৩) ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে মি. আচার্য মলনালীর ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য R. G. Kar হাসপাতালের সার্জিক্যাল বিভাগে ভর্তি হন। ডাঃ এ. কে. চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে তাঁর আক্রান্ত অংশে তেজস্ক্রিয় রশ্মি দেওয়া হয়। ২৪শে আগষ্ট থেকে তাঁকে খাবারের সঙ্গে প্রতিদিন ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর ৬x' এর ৫টি করে ট্যাবলেট দু'বার দেওয়া হতে থাকে। এতে রোগীর আক্রান্ত অংশটি এত দ্রুত কমে যায় যে, ডাক্তারবাবু খুবই অবাক হন। কিন্তু ২৭শে সেপ্টেম্বর বিকাল থেকে রোগীর মলদ্বার ও মূত্রপথে হঠাৎ প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। হাসপাতালে রক্তবন্ধের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। মৃত্যু অবধারিত, একথা পরদিন সকালে রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের জানানো হয়। তখন রোগীর ভাই প্রিন্সিপাল আচার্য আমাকে খবর দিলে আমি রোগীকে ১ ঘণ্টা অন্তর হ্যামামেলিস θ (Hamamelis θ) ৫ ফোঁটা ও ক্যালি-ফস ৬x-এর

৫টি ট্যাবলেট পর্যায়ক্রমে খাওয়াতে বলি। এতে রক্তপড়া বন্ধ হয় ও রোগী সাময়িকভাবে সুস্থ হন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত রক্তহীন হয়ে পড়েন। কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ইউরেমিয়া রোগে পরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগেও তিনি স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলেছেন ও তাঁকে কোনরূপ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি।

(৪) অধ্যাপক চ্যাটার্জির দিদি মিসেস ব্যানার্জি কয়েক বৎসর ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তাঁর পেটেCancerous fluid জমে যায়। ১৯৭৯'র জুলাই-এ তাঁকে ডাঃ শৈবালকান্তি সেনের অধীনে নিউল্যান্ডস্ নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয় fluid বের করার জন্য। ১লা আগষ্ট অধ্যাপক চ্যাটার্জি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমি রোগিণীকে প্রত্যহ ৫টি করে ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর ৬x ও ৫টি করে নেট্রাম-সালফ্ ৬x দিতে বলি। এতে তাঁর Cancerous fluid আপনা হতে মিলিয়ে যায়। ডাক্তার সেন রোগিণীকে ছেড়ে দেন ও বলেন এ অবস্থায় মাসখানেকের মধ্যে রোগিণীর মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা। যাই হোক, রোগিনীকে প্রত্যহ ঐ ঔষধগুলি দেওয়া হতে থাকে। কিছু সুস্থ হওয়ায় তিনি রায়পুরে তাঁর ভাই-এর কাছে চলে যান। তখন এখান থেকে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হত। রায়পুরে ডাঃ নিয়োগী ও তাঁর সহযোগী ঐ অবস্থাতে রোগিণীর উন্নতি লক্ষ্য করে আমার বায়োকেমিক ঔষধ খাওয়াতে বলেন। দুর্ভাগ্যবশত ডাকবিভাগের গণ্ডগোলে প্রায় ১ মাস ঔষধ বন্ধ থাকে এবং রোগিণীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়। ১৯৮০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতুকালে শ্বাসকষ্ট ছাড়া অন্য কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায় যে, শেষ অবস্থাতে ক্যান্সারে ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর দীর্ঘতর জীবন ও যন্ত্রণাহীন মৃত্যু আনতে পারে এবং প্রথম অবস্থাতে হয়তো ক্যান্সার নিরাময় করতে পারে। প্রসঙ্গত বলি, শল্য চিকিৎসার সাহায্যে ক্যান্সার কোষ অপসারণ কিংবা রঞ্জন-রশ্মি ও তেজস্ক্রিয়-রশ্মি প্রয়োগে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করলেও শরীরে অন্যত্র অবস্থিত কোষগুলি নতুন করে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। এজন্য কেমিওথেরাপি পদ্ধতিতে ফ্লুরোরাসিল ইনজেক্সন (5-Flourouracil intravenous) দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে রক্তে ফ্লোরিনযৌগ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে সুস্থ কোষের ক্ষতি করে। কিন্তু ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর (CaF_2) অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করলে তা থেকে F-আয়ন উৎপন্ন হয়। ঐ F-আয়ন অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিত কোষগুলিকে ধ্বংস করে দেবে, অথচ স্বাভাবিক কোষগুলির কোন ক্ষতি করবে না। এজন্যই ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর ক্যান্সার নিরাময় করতে পারে।

তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোষগুলি যাতে রক্তে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য ক্যালি-মিউর, ক্যালি-ফস ও নেট্রাম-সালফ দেওয়া প্রয়োজন। ক্যালি-মিউর পুঁজোৎপত্তি নিবারণ করে ও ফাইব্রিন (Fibrin) সৃষ্টিতে সাহায্য করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। ক্যালি-ফস পচন নিবারণ করে ও নার্ভের উপর কাজ করে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়। নেট্রাম-সালফ লিভার ও কিডনির উপর কাজ করে ও রক্তে দ্রবীভূত দূষিত পদার্থ মূত্রসহ বের করে দেয়। Molecular Biology অনুসারে আমাদের শরীরে কোষ গঠনে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত কোষ অপসারণে আয়ন (ions) প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। উপরোক্ত ঔষধগুলিতে সাত রকমের আয়ন প্রয়োগ করা হয়। প্রথমে আয়নের অভাব পূরণের জন্য নিম্নশক্তি ৬ x ওপরে আয়ন কনসেনট্রেশন (Concentration) বজায় রাখার জন্য উচ্চশক্তি ২০০ x দিতে হয়।

অবশ্য ক্যালি-আয়োড (গ্ল্যান্ডের আক্রমণে), হ্যামামেলিস (রক্তস্রাবে), আর্সেনিক (জ্বালায়) প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োজন হতে পারে। আমার মনে হয়, উল্লিখিত ঘটনাগুলি ক্যান্সার গবেষণায় ও চিকিৎসায় প্রভূত সাহায্য করতে পারে। সেজন্য পত্রটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শিবরাম বেরা

অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ।

উৎস মানুষ, মার্চ ১৯৮২

২. প্রসঙ্গ ।। হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞান / ক্যানসারের ওষুধ

উৎস মানুষ পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় 'হোমিওপ্যাথি একটি নিবেদন / একটি প্রস্তাব' এ প্রসঙ্গে ডাঃ সমরজিৎ জানা'র বক্তব্য ও অধ্যাপক শিবরাম বেরার যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে সেই সূত্রে আমার এই চিঠি লেখাটাকে নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করছি।

আমি একমত যে "রোগের বিরুদ্ধে যে কোন কার্যকরী হাতিয়ারের সন্ধানে দ্বিধাহীনভাবে আত্মনিয়োগ করা প্রতিটি বিজ্ঞান-সচেতন মানুষের কর্তব্য"। কিন্তু এই সন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও মানদণ্ড নির্দিষ্ট করা এবং তা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার দায়িত্বও প্রতিটি বিজ্ঞানসচেতন মানুষের কাঁধে সমানভাবে বর্তায়।

সুখের বিষয়, কোন বস্তুর রোগ-নিরাময় ক্ষমতা আছে কিনা তা স্থির করার গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও মানদণ্ড বেশ কিছুকাল ধরেই সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক মহলে চালু আছে। এ পদ্ধতি যে-কোন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতির মূলনীতির সঙ্গে এক তবে যেহেতু সচেতন জীবিত প্রাণী মানুষের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ তাই সে অনুযায়ী কিছু পরিমার্জনের প্রয়োজন আছে—এই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মত মানুষের বেলায়ও কোন রোগের সম্ভাব্য প্রতিষেধক প্রয়োগের সময় কন্ট্রোল রাখা হয়, অর্থাৎ একই রোগাক্রান্ত দু' দল রোগীর প্রথম দলের উপর সম্ভাব্য প্রতিষেধকটি ক্যাপস্যুল, বড়ি বা অন্য আকারে প্রয়োগ করা হয় আর দ্বিতীয় দলকে একই আকারের একই রকম দেখতে অথচ সম্পূর্ণ ঔষধহীন বস্তুতে পূর্ণ (Placebo) ক্যাপস্যুল বা বড়ি ইত্যাদি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দলই কন্ট্রোল গ্রুপ। এবার একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর রোগের কতটা উপশম হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ ক'রে লিপিবদ্ধ করা হয়।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এসব সাবধানতা সত্ত্বেও পর্যবেক্ষণে ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে যদি না নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিশেষ সাবধানতাগুলি নেওয়া হয় :—

(১) রোগীরা জানবেনা কোন্‌টি Placebo আর কোনটি সম্ভাব্য ওষুধ। অর্থাৎ দু দলই Placebo ও সম্ভাব্য প্রতিষেধকটি একই বস্তু হিসাবে গ্রহণ করছে।

(২) যিনি ওষুধ দিচ্ছেন এবং পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি বা তাঁরাও (যদি প্রয়োগকারী ও পর্যবেক্ষণকারী আলাদা ব্যক্তি হন) জানবেন না কোন্‌টি Placaebo অথবা কোন্‌টি সম্ভাব্য প্রতিষেধক।

(৩) তৃতীয় (বা চতুর্থ) কোন ব্যক্তি ফলাফল তুলনা করবেন। যদি দেখা যায় সম্ভাব্য প্রতিষেধকটির প্রয়োগে নিশ্চিতভাবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা সুস্থ হয়েছেন তবে অবশ্যই ঐ বস্তুটি ঐ রোগের নির্দিষ্ট (specific) ওষুধ। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই দ্বিতীয় দল অর্থাৎ কন্ট্রোল গ্রুপ, যাদের Placebo দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে নিশ্চিত-আরোগ্যের সংখ্যা উপেক্ষণীয় (insignificant) হতে হবে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় Double Blind Trial. অতিরিক্ত সাবধানতাগুলি গ্রহণের উদ্দেশ্য হল রোগী ও পর্যবেক্ষণকারীর তরফ থেকে প্রত্যাশা বা ঈপ্সামূলক কল্পনা, পক্ষপাতের ঝোঁক কিংবা স্ব-অভিভাবন (self suggestion) যতদূর সম্ভব পরিহার করা।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতির নিরিখে শ্রীবেরা প্রদত্ত উদাহরণ সমূহের কোনটিই কোন বিজ্ঞানসচেতন মানুষের কাছে কোনরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। তবুও তাঁর প্রদত্ত উদাহরণগুলি একে একে বিবেচনা করা যাক :

(ক) "তিন বৎসর পূর্বে মিসেস দাসের বুকের ক্যান্সার আক্রান্ত অংশের শল্য চিকিৎসায় অপসারণের পর অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে এবং একমাস নানা ঔষধ প্রয়োগে কোন উপকার হয়নি।" অতঃপর শ্রীবেরার চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হন।

এক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলির সদুত্তর প্রয়োজন সেগুলি হল—(i) বুকের ক্যান্সারের এই নিদান (diagnosis) কি অপারেশনের পূর্বে Biopsy দ্বারা বা পরে অপসারিত অংশ পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল? হ'য়ে থাকলে কী ধরনের ও কোন্ স্তরের ক্যান্সার ছিল? আর বুকের কী অপারেশন হয়েছিল—আক্রান্ত অংশসহ চারিপার্শ্বস্থ সমস্ত অংশ যতদূর সম্ভব বাদ দেওয়া (Radical mastectomy) হয়েছিল কি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ক্যানসার না হ'লে অথবা প্রাথমিক স্তরের ক্যানসার হলে রোগী উপরোক্ত কোষকলা অপসারণের পর সুস্থ হওয়ার কথা। সাধারণ পরীক্ষার সময় ক্যান্সার মনে হলেও অপারেশনের পরে নিদান বা ডায়াগনোসিস পাল্টাতে পারে।

(ii) এ ছাড়াও ক্যান্সার জাতীয় অসুখে সাধারণত যন্ত্রণা কম বা না-থাকারই কথা, তবে অপারেশনের পরে সংক্রমণের জন্য ক্যান্সার হ'লেও বা না হ'লেও যন্ত্রণা হতে পারে। সেক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক অথবা বহুক্ষেত্রে কেবল রোগীর শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতাই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করে—এমনিই যন্ত্রণা লাঘবে সক্ষম হতে পারে।

সর্বোপরি বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি রোগিণীকে পর্যবেক্ষণ (follow up) করেছেন কিনা তার উল্লেখ নেই। এটা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

(খ) দ্বিতীয় উদাহরণের ক্ষেত্রেও শ্রীবেরা ডান চোখ থেকে গলা পর্যন্ত ক্যান্সারে আক্রান্ত — এই বলেই ডায়াগনোসিসের ব্যাপারটা শেষ করেছেন। বায়পসির দ্বারা বা আক্রান্ত কোষকলা পরীক্ষা দ্বারা ঐ diagnosis অপারেশনের আগে বা পরে দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হয়েছিল কি না তার উল্লেখ নেই। যদি হয়ে থাকে তবে কী জাতীয় বা কোন্ স্তরের ক্যান্সার সেটাও জানা দরকার। কোনরকম কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি চিকিৎসা অপারেশনের পর শুরু হয়েছিল কি? কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই ক্যান্সার আক্রান্ত অংশ কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপির পরে দ্রুত মিলিয়ে যেতে পারে, কিন্তু শেষরক্ষা হয় না, রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে। এক্ষেত্রে

অপারেশনের কতদিন পরে রোগীর মৃত্যু হয়েছে তার উল্লেখ নেই। শুধু বলা হয়েছে বার্ধক্যজনিত কারণে ৬৮ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হয়। ক্ষুধাহীনতা ছাড়া মৃত্যুকালে তার কোন কষ্ট বা যন্ত্রণা ছিল না। অথচ ক্ষুধাহীনতা অনেক ক্ষেত্রেই ক্যান্সারের একটি লক্ষণ।

(গ) তৃতীয় উদাহরণে মলনালীর আক্রান্ত অংশে Radiotherapy'র পর তিনি হোমিওপ্যাথি শুরু করেন। এক্ষেত্রে আক্রান্ত অংশটি দ্রুত কমে যাওয়ার কারণ রেডিওথেরাপি নাকি শ্রীবেরার ওষুধ, এটা তিনি কোন্ প্রক্রিয়ায় স্থির করলেন? আর রক্ত বন্ধের সকল চেষ্টা হাসপাতালে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি যখন চিকিৎসা শুরু করেন তখন কি হাসপাতালের সব ঔষধ বন্ধ করা হয়েছিল? তা যদি না হয়ে থাকে তবে রক্ত বন্ধ তাঁর ঔষধ প্রয়োগেই হয়েছিল- এ সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছান কি করে? তাছাড়া প্রচুর রক্তক্ষরণ হ'লে রক্তের চাপ দ্রুত কমার জন্য রক্তক্ষরণও আস্তে কমে আসতে পারে। সর্বোপরি ইউরেমিয়া (Uraemia) হ'য়ে রোগীর মৃত্যু আর. জি. কর.-এর ডাক্তারদের ধারণাকেই সমর্থন করে। ...শ্রীবেরার অবগতির জন্য জানাই যে বহুক্ষেত্রেই ইউরেমিয়ায় কোমা (Coma) হওয়ার আগে পর্যন্ত রোগী কথাবার্তা এবং হাঁটা চলাও করে থাকে যা সাধারণের চোখে স্বাভাবিক অবস্থা মনে হলেও মোটেই স্বাভাবিক নয়। অতএব এ ব্যাপারেও শ্রীবেরার ওষুধের কৃতিত্বে সন্দেহ থেকেই যায়।

(ঘ) চতুর্থ উদাহরণেও দেখা যায় নার্সিং হোমে ভর্তির পর অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দু'রকম চিকিৎসাই চলেছে এবং যথারীতি শ্রীবেরা Ascites fluid কমাকে তার ওষুধের কৃতিত্ব বলে দাবি করছেন। আবারো তাঁর অবগতির জন্য জানাই অল্প বা মাঝারি পরিমাণের Ascites fluid ওষুধ প্রয়োগে সাময়িকভাবে কমান সম্ভব। আর, চিকিৎসা শুরু করার মাত্র ছ মাসের মধ্যে রোগিণীর মৃত্যু ডাঃ শৈবাল কান্তি সেনকে সঠিক বলে প্রমাণ করে। ডাঃ সেন মাসখানেকের মধ্যে রোগিণীর মৃত্যুর সম্ভাবনা বলতে বোধহয় এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত। একমাস বা দু'মাস বাঁচবে এরকম নির্দিষ্টভাবে নিদান হাঁকা কারুর পক্ষে সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়।

উপরের উদাহরণগুলি থেকে একটা জিনিস অত্যন্ত পরিষ্কার— সেটা হল, শ্রীবেরা ঔষধ প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণে ন্যূনতম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিও অবলম্বন করেন নি। একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দুই'ই চলেছে। সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সম্পূর্ণটাই তাঁর ইচ্ছামূলক চিন্তা (wishful thinking)। যে কটি উদাহরণে অসুখটি ক্যান্সার বলে মনে করা চলে তার একটিতেও রোগী বেশীদিন বাঁচেনি। তবুও তিনি সিদ্ধান্ত টানতে চান যে হোমিওপ্যাথি ওষুধে পরিণত পর্যায়ের ক্যান্সারে দীর্ঘতর জীবন ও যন্ত্রণাহীন মৃত্যু সম্ভব এবং প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো নিরাময় সম্ভব। যেখানে রোগটি ক্যান্সার কিনা এটাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয় সেখানে এ ধরনের সিদ্ধান্ত কতটা অবৈজ্ঞানিক ও সরলীকরণ তা নিশ্চয়ই নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এর পরে তিনি তাঁর ওষুধের ক্রিয়া কৌশল (mechanism of action) সম্বন্ধে যা লিখেছেন সেটাও আমার মতে wishful thinking, তাই মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি।

এবারে বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে ও তাদের মধ্যে থেকে কিভাবে রোগের বিরুদ্ধে

কার্যকরী হাতিয়ার খুঁজে বার করা যায় সে ব্যাপারে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি। বর্তমান যুগে সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে দুভাগে ভাগ করা যায় :—

১) Scientific medicine বা বৈজ্ঞানিক ভেষজ ব্যবস্থা

২) Empirical medicine বা অভিজ্ঞতালব্ধ ভেষজ ব্যবস্থা

Scientific medicine (যাকে আগে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বলা হত) মনে করে প্রতিটি ব্যাধিরই কারণ খুঁজে বার করতে হবে আর রোগের কারণ দূর হলেই রোগ নিরাময় হবে। যে সব ক্ষেত্রে কারণ জানা সম্ভব হয় নি কেবল সেসব ক্ষেত্রেই লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা ক'রে বা যতদূর কারণ জানা গেছে তার ভিত্তিতে চিকিৎসা ক'রে রোগীকে উপশম দেওয়ার বা আরোগ্য করার চেষ্টা করা হবে। এছাড়াও সংগৃহীত তথ্যের ব্যবহার ক'রে রোগাক্রমণ ও বিস্তার বন্ধ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

Empirical medicine-এ প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি সহ অন্য সব প্রচলিত চিকিৎসা-ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত—যেগুলি সম্বন্ধে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জনসাধারণ উপকারিতা বিষয়ে বিভিন্ন রকমের ধারণা তৈরি করে নিয়েছেন। যেহেতু এসব চিকিৎসাপদ্ধতির জন্ম বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে, তাই এদের অনেকের মধ্যেই গ্রহণযোগ্য প্রতিষেধক থাকা অসম্ভব নয়। হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, ইউনানি, কবিরাজী, আকুপাংচার ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

আমার এ প্রসঙ্গে একটাই বক্তব্য Scientific medicine সংস্কারমুক্ত, তাই রোগের বিরুদ্ধে যে-কোন কার্যকরী হাতিয়ারকেই সে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ ক'রে থাকে ও গবেষণার মাধ্যমে তার আরও উন্নতি বিধান করে। সুতরাং Empirical medical system গুলির মধ্যে থেকে গ্রহণযোগ্য অংশকে খুঁজে বার ক'রে উন্নত করা ও বর্জনীয় অংশকে বর্জন করার পবিত্র দায়িত্ব একমাত্র আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানই করতে পারে। অবশ্যই তার আগে গবেষকগণ সংশ্লিষ্ট Empirical medical system নিয়ে গভীর অধ্যয়ন অনুশীলন করবেন। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কোন বিকল্প নাই।

বর্তমান সময়ে সরকারি দাক্ষিণ্যে Empirical medicine-এর চর্চা যেভাবে বাড়ানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে তা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক। জনস্বার্থেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। দেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি সমূহকে বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডে যাচাই ক'রে তবেই গ্রহণীয় অংশ Scientific medicine-এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পুরনো আকারে অপরিবর্তিত অবস্থায়, ঐ সকল চিকিৎসাপদ্ধতির অনুশীলন ও জনসাধারণের উপরে প্রয়োগ আইন ক'রে বন্ধ করা দরকার এবং এ ব্যাপারে জনমত গঠন করা প্রয়োজন।

ডাঃ আশিস ঠাকুর

সুভাষগ্রাম, ২৪ পরগনা (দঃ)

উৎস মানুষ, মে ১৯৮২

৩. প্রসঙ্গ ।। হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞান / ক্যানসারের ওষুধ

উৎস মানুষ, মার্চ ১৯৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ আশিস ঠাকুরের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে মে সংখ্যায়। এ প্রসঙ্গে প্রথমে জানাই, আমার পত্রে

বর্ণিত চারটি রোগীরই ক্যান্সার বায়োপসির দ্বারা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। প্রথম রোগীর বুকের ক্যান্সার *তৃতীয়বার* অপসারণ করেছিলেন ডাঃ এ. পি. মজুমদার পার্ক ভিউ নার্সিংহোমে। ঐ সময়ে কেমোথেরাপি চললেও কোন উন্নতি হয়নি। ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর খাওয়ার পরই হঠাৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। রোগী বর্তমানে ভালো আছেন। দ্বিতীয় রোগীর ক্যান্সার-আক্রান্ত বাকি অংশ পরে অপসারণ করা হবে স্থির থাকায় ঐ সময়ে কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি করা হয়নি। *শুধু ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর খাওয়াতে ক্যান্সার কোষ-কলা কমে যায়।* সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকগণ একে "Miraculous Improvement" বলেছিলেন। কমে যাওয়ার পর রোগীকে রেডিও-থেরাপি করে ছেড়ে দেওয়া হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ রোগীদের ক্ষেত্রে আমার বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করতে চাই না।

বর্তমানে দুরারোগ্য ক্যান্সারের ঔষধ-সন্ধানে সমগ্র বিশ্বে যে গবেষণা চলছে, তাতে আমার পত্রটি (নিবন্ধ নয়) *clue* হিসাবে কাজ করতে পারে মনে করে পত্রটি প্রকাশের অনুরোধ করেছিলাম। অতএব আমার কাজ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে হয়েছে কিনা, সে তর্ক অনাবশ্যক। ডাঃ ঠাকুরের পত্রের শেষাংশে অ্যালোপ্যাথিকে Scientific Medicine এবং হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, ইত্যাদিকে Empirical Medicine বলে যে তর্ক তোলা হয়েছে, আমার পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তার কোন প্রয়োজন নেই। আমি যে পদ্ধতির কথা বলেছি, তা হোমিওপ্যাথি বা অ্যালোপ্যাথি, কোনটাই নয়। একে ion-treatment বলা যেতে পারে, যা পূর্ব পত্রের একটি অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত বলি, আমার প্রযুক্ত ঔষধটি বায়োকেমিক পদ্ধতিতে তৈরি হলেও প্রথমে ৬x শক্তিতে ব্যবহার করেছি, যাতে ঔষধের পরিমাণ one part per million, অর্থাৎ যার ৫টি ট্যাবলেটে আনুমানিক 10^{14} ion পাওয়া সম্ভব। আমাদের শরীরের নানা বিক্রিয়ায় ion-গুলি অনেকক্ষেত্রে catalyst-এর মত কাজ করে। কাজেই উক্ত পরিমাণ ions কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

শিবরাম বেরা

বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা

৪. প্রসঙ্গ ।। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, ওষুধ ও অপবিজ্ঞান

পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-সিদ্ধান্ত, শুধুমাত্র এই ছকটির ব্যবহারই কোন ঘটনাকে প্রমাণ করার বৈজ্ঞানিক শর্ত নয়। শিবরামবাবুর উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো (পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ কে-কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন) কতখানি বিজ্ঞানসম্মত ছিল সেটাই প্রথম বিবেচ্য বিষয়। আশীষবাবু এই পরীক্ষার ব্যাপারটা তাঁর চিঠিতে (মে '৮২ সংখ্যায়) বিশদভাবে ব্যক্ত করেছেন। এরপরও যদি ধরে নেওয়া যায় যে শ্রীবেরার পরীক্ষাটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে করা হয়েছিল তখন প্রশ্ন থাকে তাহলে পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতিটি আদৌ বিজ্ঞানসম্মত ছিল কি? এটা জরুরি, কেননা যে বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে রোগটি 'ক্যান্সার' বলে নির্ণীত হয়েছিল—সেরকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যেই রোগটি কমে যাওয়া বা সেরে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রমাণিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। রোগের লক্ষণ চলে যাওয়াটা কারোর কাছে

আশ্চর্যজনক ঠেকলেও তা সবক্ষেত্রে রোগ সেরে যাওয়ার সংকেত নয়, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগ ছড়িয়ে পড়ার পূর্বাভাস মাত্র। যেমন ধরন, শরীরের কোন অংশ সামান্য পুড়ে গেলে (1st degree পোড়া) তখনকার যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা তো প্রায় সবারই রয়েছে। কিন্তু যদি পোড়াটা আরও একটু গভীর হোত (2nd degree পোড়া) তাহলে কিন্তু ব্যথা, যন্ত্রণা খুবই অল্প হত বা হতই না। এমন ব্যাপার লিভার বা ফুসফুসের বহু রোগের এবং ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আসলে প্রথমে যে ব্যাপার খেয়াল রাখা প্রয়োজন তা হোল *রোগের লক্ষণগুলো তার কারণ নয়, ফলমাত্র।* আমাদের শরীরের শারীরবৃত্তীয় ঘটনাগুলো সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে এই লক্ষণগুলো কেন, কখন, কিভাবে দেখা দিচ্ছে তা বোঝা সম্ভব হবে না। আর রোগের কারণ খুঁজে *তার মূলে আঘাত করতে না পারলে শুধু 'লক্ষণ কমিয়ে' কখনোই রোগমুক্তি সম্ভব নয়;* এটা শুধু রোগের ক্ষেত্রেই নয় সমাজজীবনের অন্যান্য ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ যাই ধরি না কেন সেখানেও কারণ খুঁজে তবেই না এসব সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তির উপায় খুঁজি আমরা!

এরপর ওষুধটি শরীরে কিভাবে কাজ করে (mechanism of action) সে ব্যাপারে শিবরামবাবু তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। প্রথমে 5-Flurouracil-এর ভূমিকার কথাটা বলে নিই। এই ওষুধের ক্রিয়া পরপর কতগুলি অত্যন্ত জটিল জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যম ঘটে থাকে। বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের বিক্রিয়ার ধাপে ধাপে শেষ পর্যন্ত (পুরো বিক্রিয়াটি লিখতে অর্ধেক 'উৎস মানুষ' লেগে যাবে) তৈরি হয় 5-Fluro-2′-deoxyuridine-5′-phosphate যা ক্যান্সারকোষ বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কোষের বিরুদ্ধেও এটা কাজ করে। কিন্তু মূলত ক্যান্সার কোষগুলিতেই এর প্রতিক্রিয়া পড়ে তার কারণ ক্যান্সার কোষগুলির দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়, ওষুধটির কোন অত্যাশ্চর্য বাড়তি ক্ষমতার জন্য এটা হয় না। শুধু ক্যান্সারের এই ওষুধটিই নয়, সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের ওষুধই ব্যবহার করা হোক না কেন এই রকমটাই ঘটতে বাধ্য, কেননা এই প্রক্রিয়া নির্ভর করছে জীবকোষের মৌল ধর্মগুলির ওপর, নির্ভর করছে পদার্থবিদ্যা রসায়নবিদ্যার বহু মৌল সূত্রের ওপর। তাই আজকের দিনে এমন কোন ওষুধ, যা শুধু ক্যান্সার কোষকেই আঘাত করবে, তার পরীক্ষা তো বহুদূরের কথা ন্যূনতম যুক্তির স্তরেও যদি কেউ সেটাকে উপস্থাপিত করতে পারেন তবে তা হবে যুগান্তকারী একটি কাজ। কিন্তু শর্ত হল—কেন এবং কিভাবে তা করতে পারে তার একটু রাস্তা জানাতেই হবে। প্রসঙ্গত একটা কথা বলে নিই। ওষুধের এই কর্মপদ্ধতি (mechanism of action) ডাক্তারদের মত কোন Technician-দের মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যাপার নয়। আজকের দিনে কোন ড্রাগ আবিষ্কারের কাজ শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোন একটি শাখার কাজ নয় বরং বহু শাখা এবং তার প্রশাখার অসংখ্য একনিষ্ঠ গবেষকের দীর্ঘস্থায়ী সাধানার ফলশ্রুতি বা উন্নততর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞান তথা উন্নততম গবেষণার ফসল। কার্যত একটি ড্রাগের কার্যপ্রণালীর আবিষ্কার চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণ বা এ ধরনের দুরূহ কাজগুলির সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয়।

এবার ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর (CaF_2)-এর কথায় আসা যাক। মজার ব্যাপার হোল, আমাদের

পানীয় জলের একটি আবশ্যকীয় উপাদান হল এই ফ্লোরাইড। এবং আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় ফ্লোরিনের প্রায় পুরোটাই সংগৃহীত হয় এই জল থেকেই। এমনকি আমাদের ব্যবহৃত অধিকাংশ পানীয় জলে এই ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর বা ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড (CaF_2) রয়েছে। শুধু তাই নয় আধুনিক শারীরবিজ্ঞান এই দুই (ক্যালসিয়াম ও ফ্লোরিন) প্রয়োজনীয় মৌল শরীরের কোন্ কোষ কখন, কিভাবে, কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করবে তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। এই মৌলের কোন-একটি কতটুকু কম বা বেশি হলে শরীরের কোন্ কোষে কী পরিবর্তন বা কী ক্ষতি এনে দেবে তাও আজ অজানা নেই এবং তার চিকিৎসা কিভাবে করা উচিত তাও সহজবোধ্যতার স্তরে এসে গেছে। তাই আর যাই হোক, ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর নিয়ে luck-try বা তুকতাক করার আর কোন জায়গাই আজকের দিনে খোলা নেই।

প্রসঙ্গত একটা ব্যাপার কিন্তু লক্ষণীয়। আজকের দিনে হারু মুদি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত কাউকেই কিন্তু পরমাণুর কেন্দ্রের গঠনবৃত্তান্তের উপর নতুন কোন সূত্র দিতে শোনা যায় না কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা হামেশাই দেখা যায়। এর পিছনে রয়েছে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রথম ব্যাপারটির পিছনে সম্ভবত রয়েছে এই কারণ দুটো :—

(১) সাধারণের চোখে চিকিৎসাবিজ্ঞান বলতে কখ্, পাস্তুর, বড়জোর ফ্লেমিং-এর আবিষ্কারগুলো পর্যন্তই মূলত বোঝায়।

(২) কিছু ভেষজ বা রসায়নের ভিতর সমগ্র চিকিসাবিজ্ঞানের যাবতীয় রহস্য ও সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়ানোর প্রবণতা রয়ে যায়। অথচ আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর ব্যাপ্তি ও বিশালতা তাকে ধারণায় আনাটাই যে কষ্টকর। (অবশ্যই অন্যান্য বিজ্ঞানের মৌল তথা কারিগরী উন্নতির দৌলতেই এই বিশাল অজানা জগতের চাবিকাঠি ঘোরানো সম্ভব হয়েছে।) *প্রত্যেক দু-এক বছর অন্তর চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক একটি নতুন শাখা বা তার প্রশাখাকে আলাদা করে দিতে হচ্ছে*—বিস্তারের হার এমনই দ্রুত। ক্যান্সারের কথাই ভাবুন; শুধুমাত্র বিগত কয়েকটি বছরে এর সম্বন্ধে যেটুকু জানা গেছে শুধু সেটুকু বিষয় জানতে-বুঝতে বছর খানেকের গভীর অধ্যয়নও কুলিয়ে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ। তাই ক্যান্সারের ওষুধের কার্যপ্রণালী ইত্যাদির উপর 'clue' দিতে গেলে এই আধুনিক গবেষণার পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতেই দিতে হবে; সেটুকু শ্রমের কষ্ট তো করতেই হবে।

সাধারণের ধারণায় চিকিৎসাবিজ্ঞান কয়েকটি ভেষজের ভিতরই আবদ্ধ। অথচ সমস্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি মাত্র অংশ হল রোগ সারানোর (Curative) ব্যাপার, তারই একটি পদ্ধতি হিসাবে কোন ভেষজ বা রসায়নের ব্যবহার হয়। তাই রোগমুক্তির জন্য দরকার প্রথমত—রোগ হওয়ার পিছনের কার্যকারণ সম্পর্ক বা বিজ্ঞানাদি জানা-বোঝা। সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানটা ধরতে না পারলে শুধুমাত্র তার প্রয়োগের একটি মাত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে সবকিছুর উপর মন্তব্য বা সূত্র দেওয়ার চেষ্টা করলে স্বভাবতই প্রচুর বিপত্তি দেখা দেবে। বিশেষত আমাদের এই অস্থির সামাজিক পরিবেশে সর্বদাই আমরা ম্যাজিক খুঁজতে ব্যস্ত; লটারী বা ফাটকাবাজিতে বড়লোক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা শিবের মাথায় জল ঢেলে রোগমুক্তির মানসিকতার সঙ্গে কয়েকটা বড়ি বা একটা ইনজেক্শানের ভেতর রোগমুক্তির একমাত্র 'ম্যাজিক' খোঁজার এই প্রবণতার কোন তফাৎ নেই। আর যে মুহূর্তে এই 'ম্যাজিক' আর দেখা গেল না অমনি বিজ্ঞানটাই আর গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না। তখন অদ্ভুত, অযৌক্তিক সব

বক্তব্যের জাল বোনা ছাড়া উপায় থাকে না—দু-পাতা লাল বই পড়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের তত্ত্ব-আওড়ানোর মত ব্যাপারটা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ব্যাপারটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করে দেখবেন এই ধরনের সূত্র বা clue দেওয়ার চেষ্টা বা ইচ্ছা হয় সেইগুলোতেই যে দুঃখকষ্টগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আর ভয়টা সেখানেই। দিনের পর দিন বিজ্ঞানের আলোকে ভূত, প্রেত, দেবতারা যতই তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন *পাশাপাশি ততই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে অপবিজ্ঞানের ভূত।* কয়েকটা বিজ্ঞানের শব্দ বা সংকেত বা বিভ্রান্তিকর যুক্তি ব্যবহার করে আজ সমাজজীবনের অসংখ্য ঘটনাকে প্রামাণ্য বলে হাজির করতে চাইছেন অনেকে সাধারণের সামনে, কেননা ব্যাপারটা তখন আর সাধারণের বোধগম্যের স্তরে থাকছে না যে! এটা একটা সামাজিক ঘটনা (Social Phenomena)। সবাই যে খুব উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে এটা করেন এমন নয়। বিশেষত বেরাবাবুর মত মানুষ খুব সততার সাথে সাধারণের স্বার্থের কথা ভেবেই তা রাখতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ঘটনাটা সবক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির ভালমন্দের উপর আর দাঁড়িয়ে থাকে না—সামাজিক ধারার প্রেক্ষাপটেই তাকে বিচার করতে আমরা বাধ্য। আজকের এই ধারাটা কার্যত বহুজনের অসৎ উদ্দেশ্য-সিদ্ধিরই বনিয়াদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বেরাবাবু ভাবতে পারেন তাঁর এই বক্তব্যে কী এমন ক্ষতি হবে—বিশেষত তিনি তাঁর বক্তব্যকে তো প্রামাণ্য হিসাবে হাজির করেন নি, সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মাত্র। ঠিকই। কিন্তু একটা লেখা শেষ পর্যন্ত পাঠকদের কাছে (বিশেষত আমাদের দেশে 'ছাপার অক্ষরে'র আলাদা মূল্য রয়েছে) কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে সেটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কোন ব্যক্তির সৎ ইচ্ছাটাই যথেষ্ট নয়। পত্রিকায় বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে নিজের এবং সমগ্র ব্যাপারটার উপর সম্যক ধারণা ও গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করলে সব থেকে ভাল হয় (এটা ভাবা নিশ্চয়ই অমূলক যে সম্পাদক সর্ববিদ্যাবিশারদ হবেন)। দিন দিন অপবিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী ক্ষমতার দৌড় আজকে অনেকেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আজকের দিনে বহু সামাজিক শোষণ বা অন্যায়ের বড় হাতিয়ার হয়ে দেখা দিচ্ছে এই অপবিজ্ঞান। সেখানে সতর্ক থাকার কথাটি বারবার উচ্চারণ করাটা অহেতুক বাগবিস্তার হবে না বলেই পুনরুল্লেখ করছি। কোন সৎ উদ্দেশ্যই অপবিজ্ঞানের রাস্তায় শেষ পর্যন্ত মানুষের মঙ্গল আনতে পারে না—পারা সম্ভব নয়।

ডাঃ স্মরজিৎ জানা

হাইজিন ইন্‌স্টিটিউট, কলকাতা

উৎস মানুষ, সেপ্টেম্বর ১৯৮২

পত্রিকার পক্ষ থেকে

শ্রীশিবরাম বেরার মূল চিঠিটি 'উৎস মানুষ' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে—সে উদ্দেশ্য পরিষ্কার করেই বলা ছিল সেখানে (মার্চ '৮২ সংখ্যা)।

হোমিওপ্যাথি তথা প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের (যাকে চলতি কথায় অ্যালোপ্যাথি বলা হয়) পারস্পরিক অসহনীয়তা, অবজ্ঞা ও দম্ভের সম্পর্কটা সামগ্রিকভাবে রোগের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামকে দুর্বল ও বিভ্রান্ত করছে বলে আমরা মনে করি। এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান হতে পারে একটি সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনামূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে। সে কারণেই 'উৎস মানুষ'-এর পাতায় এ বিতর্ককে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। ...গত জুন মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার উদ্যোগে 'হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞান' প্রসঙ্গে একটি সেমিনার হয়ে গেছে। নানাবিধ মতামত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়েছিলো সেখানে। সে আলোচনাচক্রের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এখানে। আগ্রহী পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো হল।

সম্পাদকমণ্ডলী, উৎস মানুষ

সেপ্টেম্বর ১৯৮২

একটি বিতর্কিত (অ-) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

গৌতম ব্যানার্জি

গত ৩০ জুন, ১৯৮৮ তারিখে বিখ্যাত নেচার পত্রিকা একটি গবেষণাপত্র ছাপিয়েছে যা বিজ্ঞানী মহলে সন্দেহ ও বিরক্তি জাগিয়েছে। নেচার পত্রিকার সম্পাদক সেই সংখ্যার সম্পাদকীয়তে হেড-লাইন দিয়েছেন 'When to believe the unbelievable' এবং সতর্ক করেছেন যে ঐ গবেষণাপত্রের সিদ্ধান্ত যেন আমাদের প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভিত্তিকে অযথা নাড়া না দেয়। কেননা, ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কি কি ফাঁক রয়ে গেছে তা অনুসন্ধান করা হয় নি।

ঐ গবেষণাপত্রে যে পরীক্ষার ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে এরকম : মানুষের রক্তে এক বিশেষ ধরনের শ্বেত কণিকা আছে যাদের গায়ে ইমিউনোগ্লোবিন- E নামের অ্যান্টিবডি (IgE-antibody) লেগে থাকে। যদি ঐ শ্বেত কণিকাদের IgE-antibody-র অ্যান্টিবডির (anti-Igi-antibody) সাথে বিক্রিয়া করতে দেওয়া হয় তা হলে শ্বেত কণিকারা হিস্টামিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নির্গত করে। ঐ অবস্থায় শ্বেত কণিকাদের বিশেষ ধরনের রঞ্জকের সাহায্যে সাধারণ শ্বেত কণিকা থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। যদি কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্বেত কণিকাকে anti=IgE-antibody-র $১০^{-২০}$ থেকে $১০^{-১২০}$ মাত্রার লঘু দ্রবণে মেশানো হয় তাহলে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় (অর্থাৎ শ্বেত কণিকা থেকে হিস্টামিন নির্গত হয়), যদিও $১০^{-১২০}$ অংশে ভাগ হওয়া দ্রবণে অ্যান্টিবডির এক অণুও থাকার কথা নয়। বিবরণে আরও বলা হয়েছে যে, দ্রবণকে ভালোভাবে না ঝাঁকালে ফল পাওয়া যায় না এবং খুব সম্ভবত জলের অণুর গঠনের মধ্যে অ্যান্টিবডির ছাপ বা 'স্মৃতি' থেকে যায়, যার ফলে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

প্রাথমিকভাবে এই গবেষণার কাজ ফ্রান্সে হয়েছিল এবং কাজের মূল গবেষক J. Benveniste গবেষণাপত্রটি দু বছর আগে *নেচারে* পাঠিয়েছিলেন। *নেচার* প্রথমে পেপারটি না ছাপিয়ে কাজের যথার্থতা বিচারের জন্য তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের বিজ্ঞানী ও অবিজ্ঞানী মহলে এবং পত্র-পত্রিকায় ঐ কাজের খবর জানাজানি হতে থাকে। *নেচার* দাবি করে যে, তদন্তের কাজে সহযোগিতা করলে এবং ঐ ধরনের কাজ অন্য কোনো দেশের ভিন্ন ল্যাবরেটরিতে যাচাই করে নেওয়া গেলে তারা ছাপতে রাজি আছে। *নেচারের* সম্পাদকের বক্তব্য যে, সত্য ঘটনা কি তা খোলাখুলিভাবে সবাই জেনে যাক। দু' বছর পর ইজরাইল, কানাডা ও ইতালির ল্যাবরেটরিতে ঐ কাজের ফলাফল সমর্থিত হওয়ার পর মোট চার টি দেশের বিজ্ঞানীর নাম বহন করে ঐ গবেষণাপত্র ছাপা হয়।

এই ধরনের গবেষণা কতটা বিশ্বাসযোগ্য বা কতটা বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানীরা গবেষণার

সিদ্ধান্তগুলিকে কি চোখে দেখছেন, তার সারাংশ পাওয়া যায় আর একটি বিখ্যাত জার্নাল *সাইন্স* এর সম্পাদক D. E. Koshland-এর বক্তব্যে —

> the improbability of the test results had been established by many earlier experiments and the data published in this case did not seem to make sense. They were internally peculiar. The role of a scientific journal should be to encourage heresy but discourage fantasy. While there is nothing wrong in publishing something that turns out to be wrong, the situation is different when a propostion, such as perpetual motion or memory in water, is totally implausible.

পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে অংশটুকু fantasy সৃষ্টি করেছে তা হলো অ্যান্টিবডি দ্রবণকে $১০^{-২০}$ থেকে $১০^{-১২০}$ মাত্রায় লঘু করা, কেননা সেক্ষেত্রে অ্যাভোগাড্রো সূত্র অনুযায়ী দ্রবণে এক অণু অ্যান্টিবডিও থাকার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া দ্রবণকে জোরে না ঝাঁকালে কাজ হবে না, সেটাও একটা উদ্ভট ব্যাপার। এই সমস্ত শুনে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে ঐ বিজ্ঞানীরা কি হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করেন? অনুমান কিছুটা সত্যি। ছাপানো গবেষণাপত্রে লেখক হিসাবে যে-সব বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্তত দুজন হোমিওপ্যাথি চর্চা করেন। প্রধান গবেষক Benveniste বলেন যে, তিনি হোমিওপ্যাথি চর্চা করেন না, বরং হোমিওপ্যাথি তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যই ঐ পরীক্ষাগুলি করেন। পরীক্ষার ফলাফল তাঁকে বর্তমান সিদ্ধান্তগুলি সমর্থন করতে বাধ্য করেছে।

ইতিমধ্যে নেচার তাদের নিজস্ব তদন্ত শেষ করেছে। সেই তদন্তের রিপোর্ট এবং তার প্রত্যুত্তরে J. Benveniste-এর বক্তব্য ছাপা হয়েছে *নেচারে* (৩৩৪ সংখ্যা, জুলাই ২৮, ১৯৮৮, পৃ. ২৮৭-২৯১)। যে কোনো উৎসাহী পাঠক এই রিপোর্ট পড়ে বেশ কিছু শিক্ষা নিতে পারবেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে J. Benveniste খোলাখুলিভাবে তাঁদের তদন্তে সহযোগিতা করে প্রশংসা পাবার উপযুক্ত কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁর গবেষণাপত্রে প্রকাশিত সিদ্ধান্তগুলি সমর্থন করার জন্য যে ধরনের পরীক্ষার ডিজাইন করা প্রয়োজন ছিল তার ব্যবস্থা করেন নি। বিশেষ করে সঠিক সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচার করা হয় নি। তদন্তকারী সদস্যরা অকুস্থলে যে ধরনের 'ব্লাইন্ড পরীক্ষা' করেছেন তার ফলাফল গবেষণাপত্রের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে না। প্রত্যুত্তরে Benveniste তদন্তে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছেন যে, এটা 'অ-প্রফেশনাল,' 'অ্যামেচারিশ' 'উইচহান্ট' (witchhunt)-এর মতো কাজ। 'ম্যাককার্থীবাদের নিদর্শন।'*

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তদন্তকারী সদস্যরা কেউ প্রাসঙ্গিক গবেষণা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নন। তাঁদের একজন স্বয়ং *নেচারের* সম্পাদক (John Maddox), আর একজন NIH-এর বিজ্ঞানী (W. W. Stewart) এবং অন্যজন ম্যাজিশিয়ান (J. Randi)। এঁরা শুধু ফ্রান্সের ল্যাবরেটরির কাজ তদন্ত করতে পেরেছেন। কানাডা, ইতালি ও ইজরাইলের

---

* ম্যাকার্থীবাদ : পঞ্চাশের দশকের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পটভূমিতে আমেরিকায় 'কমিউনিস্ট' তথা 'দেশদ্রোহী'দের বিরুদ্ধে কুৎসা, দমন-পীড়ন ও ষড়যন্ত্রের এক ব্যাপক অভিযান হয়েছিল। উইসকনসিন-এর রিপাবলিকান সেনেট সদস্য জোসেফ ম্যাকার্থী ছিলেন এই অভিযানের অন্যতম মূল মুখপাত্র। তাঁর নাম অনুসারেই 'ম্যাকার্থীবাদ' কথাটির উদ্ভব।

ল্যাবরেটরিতে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তার চুলচেরা বিচার করার সুযোগ পান নি। আমার এই প্রতিবেদন J. Benveniste-এর কথা দিয়েই শেষ করছি—

The only way definitively to establish conflicting results is to reproduce them. It may be that all of us are wrong in good faith. This is no crime, but science as usual, and only the future knows.

সূত্র

১. *Nature* ৩৩৩, পৃ. ৮১৬, জুন ৩০, ১৯৮৮।

২. *Nature* ৩৩৪, পৃ. ২৮৭, জুলাই ২৮, ১৯৮৮।

৩. Walter Sulivan. *The New Work Times*, পৃ. A-৭, জুলাই ২৭, ১৯৮৮।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৮৮

হোমিওপ্যাথির পরীক্ষামূলক ভিত্তি : একটি বিতর্ক

সুদীপ্ত সরস্বতী

৩০ জুন, ১৯৮৮, *নেচার* (পৃ ৭৮৭, ৮১৬-৮১৮)।

এই সংখ্যাতেই বেনভেনিস্ত ও তাঁর সহযোগীদের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় (এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে এই বই-এর পৃ. ৫০ গৌতম ব্যানার্জির লেখায়)। সংখ্যাটি শুরু হয়েছে *কখন অবিশ্বাস্যকেও বিশ্বাস করবে (When to believe the unbelievable)* শীর্ষক সম্পাদকীয়। এই সম্পাদকীয়র কিছু বক্তব্য :

> এ সপ্তাহের সংখ্যায় একটা প্রবন্ধ (article) এমন কিছু পর্যবেক্ষণের বর্ণনা দিচ্ছে, এখন পর্যন্ত যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। সঙ্গত কারণেই বিচক্ষণ লোকেদের এ মুহূর্তে রায় মুলতবি রাখা উচিত।... এসব পর্যবেক্ষণের কোনো অবজেকটিভ ব্যাখ্যা নেই।... বিশেষ করে ফ্রান্সের যে-সব লোকেরা জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যমগুলোর গুজবের শিকার হয়েছেন, তাঁদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সত্যিকারের বিবরণ তুলে ধরা লেখাটি প্রকাশের একটা উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানী সমাজের সদাজাগ্রত যে-সব সদস্য অন্যের কাজকর্মের ফাঁকফোঁকর খুঁজে বের করতে সুদক্ষ, তাঁরা (বেনভেনিস্তের লেখায় প্রকাশিত) সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য যাতে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষার পরামর্শ দিতে পারেন, সেটাও এ লেখা ছাপানোর আরেকটা উদ্দেশ্য।... হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বেনভেনিস্তের প্রবন্ধকে স্বস্তির কারণ ও সহায়ক হিসেবে স্বাগত জানানোর ঝোঁক দেখা দিলে তা হবে অপরিণত, সম্ভবত ভুল সিদ্ধান্ত। জল আরো গড়ালে তবেই ওরকম স্বীকৃতি দেওয়ার সময় আসতে পারে।

গবেষণাপত্রটির শেষে *Editorial reservation* শিরোনামে লেখা :

> এই প্রবন্ধের বহু বিচারকের (referee) বিচারে যে অবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে, পাঠকেরাও তার অংশীদার হতেই পারেন।.... যে ধরনের ফলাফলের কথা এতে বলা হয়েছে, তার কোনো ভৌত ভিত্তি (physical basis) নেই। বেনভেনিস্তের সহযোগিতায় *নেচার* তাই নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারীদের পাঠিয়ে দেখবে, পরীক্ষাটার পুনরাবৃত্তি ঘটানো যাচ্ছে কি না। এই অনুসন্ধানের রিপোর্ট শিগ্‌গির বেরোবে।

১৪ জুলাই ১৯৮৮, *নিউসাইন্টিস্ট* (পৃ. ৩৯)।

প্রতিবেদনের শিরোনাম : *ভুতুড়ে অ্যান্টিবডির পাল্লায় বিজ্ঞানীরা হতবুদ্ধি*

প্রতিবেদনের বক্তব্য :

> হোমিওপ্যাথি কি প্রতিষ্ঠিত হলো?... উদ্যোগী হোমিওপ্যাথরা উল্লসিত। ওদিকে বিজ্ঞানীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে *নেচারের* একটা পেপারের প্রতি অবিশ্বাস জ্ঞাপন

> করছেন।... অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেচার এই চমকপ্রদ ফলাফল (remarkable result) প্রকাশ করেছে।

এ প্রসঙ্গে কিছু বিজ্ঞানীর প্রতিক্রিয়া—
লন্ডনের গাইস্ হস্পিটালের টাক লী (Tak Lee) :

> আলাদা আলাদা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষাটার পুনরাবৃত্তি না ঘটালে একেবারেই উড়িয়ে দিতাম। তবু এখনো এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

অক্সফোর্ড মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের সেলুলার ইমিউনোলজি ইউনিটের নীল বার্কলে :

> রায়দানে বিরত থাকছি, যতক্ষণ না পরীক্ষাগুলোর আবার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে।

শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মলিকিউলার ইমিউনোলজিস্ট ডেনিস বার্টন :

> আমার ধারণা এটা একটা ফালতু ব্যাপার। তবে এরকম কৌতূহলোদ্দীপক গবেষণাপত্র খুব কমই পড়েছি। সত্যিই এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া দরকার। যদি পর্যবেক্ষণটি সত্যি হয় তবে বুঝতে হবে এমন কোনো বল (force) কাজ করছে যা আমরা বুঝছি না। স্বর্গীয় হস্তক্ষেপও হতে পারে! স্পষ্টতই, পর্যবেক্ষণটির মধ্যে অন্য কোনো কৃত্রিম ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে (artifact)। হয় এটা অজান্তে হয়েছে, নয়তো কেউ বিরাট ধোঁকা দিয়ে দেখছে নেচারে তা ছাপা যায় কি-না।

নেচার পত্রিকার পিটার ডেনমার্ক :

> আমি ভাবতেই পারি না যে আমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যে কেউ এত সময়, পরিশ্রম আর কষ্ট স্বীকার করতে পারে।

যে ধরনের ইমিউন রেসপন্স নিয়ে বেনভেনিস্তেরা কাজ করেছেন, তাতে বেথেস্ডার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটস অফ হেলথের হেন্‌রি মেৎজার (Henry Metzger) অথরিটি হিসেবে গণ্য হন। তাঁর সহযোগী জাঁ-পিয়ের কিনেত (Jean-Pierce Kinet) :

> আমরা ফরাসী বিজ্ঞানীদলের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর চেষ্টা করব। আমরা মানুষের বেসোফিলের বদলে ইঁদুরের বেসোফিল নিয়ে কাজ করি। বেনভেনিস্তের পরীক্ষা একই ধরনের অন্য সিস্টেমেও করে দেখা উচিত। পরীক্ষাটা করা খুবই সোজা আর আমরা 'চাষ করা' (culture-এ grow করানো) কোষ নিয়ে কাজ করি যা অনেক বেশি পরিষ্কার (cleaner) বেনভেনিস্তেকে মানুষের কোষ আলাদা করতে হয় আর কোষ আলাদা করতে গিয়েই হয়ত অজান্তে কোনো কৃত্রিম ব্যাপার (artifact) ঘটে যাচ্ছে।... যতক্ষণ না অন্যভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ আমি কিন্তু সন্দেহের চোখেই ব্যাপারটা দেখছি (skeptical)।

দু-বছর আগে গ্লাসগো রয়াল ইনফার্মারির ডেভিড রেইলি (David Reilly) ও তার সহযোগীরা ডাবল ব্লাইন্ড কনট্রোলড এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কার্যকারিতার খোঁজ পেয়েছিলেন বলে *ল্যানসেট* পত্রিকায় দাবি করেছিলেন (সূত্র : *Lancet* ২, ৮৮১-৮৮৬, ১৯৮৬)। রেইলির বক্তব্য :

> বেনভেনিস্তের গবেষণার ফল একটা ব্রেকথ্রু (breakthrough)। গ্লাসগো হোমিওপ্যাথিক হস্‌পিটালের উইলিয়ম বয়েড (Boyd) প্রায় একই ধরনের ফলাফল পেয়েছিলেন পঞ্চাশ বছর আগে। কিন্তু বিজ্ঞানীমহল তাতে আমল দেন নি।... হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কখনো কখনো উপসর্গ বাড়িয়ে দেয়। বেনভেনিস্তের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ডাইলিউশনে কাজকর্ম পর্যায়ক্রমে বাড়ে-কমে। ব্যাপারটা তাই তাৎপর্যপূর্ণ।

নিউ সাইন্টিস্টের প্রতিবেদনের উপসংহার :

> বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই ব্যাপারটাকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। বার্টনের ভাষায়, সম্ভবত 'কোনো স্বর্গীয় সত্তা আমাদের সঙ্গে একটু রসিকতা করছেন।'

২১ জুলাই ১৯৮৮, *নিউ সাইন্টিস্ট* (পৃ. ২৬)

অ্যান্টিবডিদের ধাঁধা সমাধানের জন্য নেচার ভূততাড়ুয়াদের (ghostbusters) *পাঠিয়েছে* শিরোনামে ছোটো একটা খবর এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২৮ জুলাই ১৯৮৮ *নেচার* (পৃ. ২৩৫-২৯১)।

চিঠিপত্র বিভাগে শিরোনাম : *বেনভেনিস্তের ব্যাখ্যা*। নেদারল্যান্ড ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের রোনাল্ড এইচ. এ. প্লাস্টের্ক-এর চিঠির বক্তব্য :

> (বেনভেনিস্তে ও অন্যান্যদের মূল নিবন্ধটিতে) হোমিওপ্যাথির পক্ষে চিরাচরিত দাবিগুলির সব বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান .....। পরে দেখা যাবে, পর্যবেক্ষণগুলি কৃত্রিমভাবে উদ্ভূত অন্য কোনো কারণে পাওয়া গিয়েছিল। তবে ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে—একটা প্রধান বিজ্ঞান পত্রিকায় হোমিওপ্যাথির প্যারাডাইমের বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি। হোমিওপ্যাথিক ওষুধশিল্প (যারা ফ্রান্সের সমস্ত ওষুধের পনের শতাংশ সরবরাহ করে) *নেচার* পত্রিকার ছোট্ট অস্বীকৃতির দিকে নজরই দেবে না (যা জনপ্রিয় সংবাদ-মাধ্যমগুলোতে মূল দাবির তুলনায় অনেক কম গুরুত্ব পাবে)...।
> ছাপানোর পর তদন্ত না করে পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে আগেভাগেই স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হওয়া *নেচারের* উচিত ছিল।

বেলজিয়ামের ল্যাবরেটরিস-এর Ignace Lasters ও Michel Bardiaux :

> খতিয়ে দেখা দরকার, যে পাত্রে পরীক্ষা চালানো হয়েছে তার গায়ে আগে থেকেই অ্যান্টি-আই. জি-ই অণু লেগেছিল কি না।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিড টেইলর রেইলি বেনভেনিস্তেকে সমর্থন করে তাঁর কাজকে 'হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানের উন্নতি' (a development from homeopathic science) বলে অভিহিত করে লিখেছেন :

> যদি আমরা ঐ পর্যবেক্ষণকে ভুল প্রমাণ করতে পারি তাহলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সবচেয়ে বিচ্ছিরি ধরনের দুরভিযানগুলোর একটা হিসেবে (as one of medical science's greatest misadventures) হোমিওপ্যাথি প্রতিপন্ন হবে— এরকম প্রকাণ্ড নির্বুদ্ধিতাই আলাদা করে অনুসন্ধানযোগ্য—কেন প্রতি চারজন ফরাসি ডাক্তারদের একজন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন?

ফ্রান্সের পাস্তুর ইন্সটিটিউটের Antoine Danchin-এর বক্তব্য :

> অ্যান্টিবডি না থাকা সত্ত্বেও অ্যান্টিবডির কাজ পাওয়ার কারণ হতে পারে কাচ থেকে আসা কিছু দূষণকারী অণু বা আয়ন [some ion (for other contaminant molecule)]।

সুইজারল্যান্ডের Universitatsspital Zurich-এর ডবলিউ ফায়ার্জ :

> গবেষণাপত্রে বর্ণিত স্টান্ডার্ড এরর (standard error) ত্রুটিপূর্ণ।

ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানির স্কুল অফ ম্যারিটাইম স্টাডিজের কুর্ট ওপিৎজ (Kurt Opitz)-এর বক্তব্য :

> 'প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলোর পক্ষে অস্বস্তিকর' শুধুমাত্র এই যুক্তিতেই কোনো পর্যবেক্ষণকে সন্দেহের চোখে দেখা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে অন্তরায়।

নেচার পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেই তদন্তকারী দলের প্রতিবেদন এবং বেনেভেনিস্তের প্রত্যুত্তর ছাপানো হয়েছে। তদন্তকারী দলের বক্তব্য, তাঁরা বেনভেনিস্তের পরীক্ষাগারে গিয়ে বেনভেনিস্তে ও সহকর্মীদের পর্যবেক্ষণের পুনরাবৃত্তি হতে দেখেন নি। তদন্তকারী দলের সদস্য ম্যাডক্স, র‍্যান্ডি ও স্টিউয়ার্ট-এর ভাষায়—

> (বেনভেনিস্তেদের মূল) পরীক্ষার পর্যবেক্ষণগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে-সব চমকপ্রদ দাবি করা হয়েছে তার তুলনায়, পরীক্ষার সময় যে পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল তা যথেষ্ট ছিল না।

এঁদের রিপোর্টে একেবারে খোলাখুলিভাবে না হলেও ইঙ্গিতে বেনভেনিস্তে ও সহকর্মীদের সম্পর্কে একটা কটাক্ষের ভাব বেশ স্পষ্ট। এঁরা অবশ্য ইজরায়েল ও মিলানের গবেষকদের পাওয়া তথ্য সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু বলেন নি, বরং এগুলিকে বেনভেনিস্তের ল্যাবরেটরির তথ্যের তুলনায় আপাতদৃষ্টিতে আরো মজবুত বলেই মন্তব্য করেছেন। তবে এগুলি সরাসরি তাঁদের তদন্তের আওতায় ছিল না।

বেনভেনিস্তে তাঁর প্রত্যুত্তরে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে তদন্তকারী দল অন্যায়ভাবে তাঁদের দেখানো তথ্য ও পর্যবেক্ষণকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং একতরফা সিদ্ধান্তে এসেছেন। এই প্রত্যুত্তরেই বেনভেনিস্তে আর একটি বক্তব্য রেখেছেন—কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক কোম্পানি থেকে গবেষণার অর্থ এসেছে, এ থেকেই কি প্রমাণ হয় যে পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি মনগড়া? তাহলে তো যে-সব গবেষণায় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা আসে তার সবগুলি নিয়েই প্রশ্ন তুলতে হয়। এর ভিতর বেশ কিছু নোবেল পুরস্কারজয়ী কাজও আসবে!

৪ অগাস্ট, ১৯৮৮, *নিউ সাইন্টিস্ট* (পৃ. ৩০-৩১)।

প্রতিবেদনের শিরোনাম : *প্যারিস থেকে ভুত-তাড়ুয়াদের রিপোর্ট।*

নেচারের তদন্তকে 'unusual step' এবং তদন্তকারী দলের গঠনকে 'unusual' আখ্যা দিয়ে প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে :

> পুনরাবৃত্তি করতে পারা reproducibility বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একই মূলনীতি (keystone) হলেও কেবলমাত্র সেটাই কোনো পরীক্ষার বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট নয়। একই artifact বার বার একই ভুল ফলাফলের জন্ম দিতে পারে। বেনভেনিস্তে কিছু উদ্যোগী হোমিওপ্যাথের সাহায্যে নিজেই বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষাটার পুনরাবৃত্তির ব্যবস্থা করে নিজের হাত দুর্বল করেছেন। বহু সমালোচকের মতে, *নেচারের* উচিত ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ল্যাবরেটরিকে বেনভেনিস্তের পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে অনুরোধ করা। ...ওদিকে রেইলি কিন্তু পুনরাবৃত্তি না ঘটাতে পারার ভিত্তিতে বেনভেনিস্তেকে উড়িয়ে দিতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য : 'এটা হতেই পারে যে এমন কিছু চলক (variable) রয়েছে যাদের আমরা জানি না, তাই নিয়ন্ত্রণও করতে পারি না।' তিনি ও তাঁর সহযোগীরা পরীক্ষাটা নিজেদের ল্যাবরেটরিতে করার চেষ্টা করছেন।

নিউ সাইন্টিস্ট প্রশ্ন তুলছে :

> *নেচার* কেন আগে ছাপল, পরে অনুসন্ধান করল? *নেচারের* দাবি, এ লেখা প্রকাশ করার একটা কারণ, বেনভেনিস্তের কাজকর্মের খবর জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যমগুলোতে বেরোচ্ছিল।...অথচ, পত্রিকায় প্রকাশের আগেই যারা তাদের গবেষণার ফলাফল কাগজে ফাঁস করে দেয়, তাদের লেখা নেচার না ছাপার হুমকি দিয়েছিল কয়েক বছর আগেই।
>
> অসংখ্য অ-আনুষ্ঠানিক আলোচনা (informal meetings), কনফারেন্স, সহযোগিতা এসব নিয়ে যে বিজ্ঞানীমহল (scientific community), এতদিন পর্যন্ত তার সামান্য) অংশ জুড়ে ছিল বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকা আর তাদের বিচারকেরা। অনেকের বক্তব্য এখন একটা নতুন অ্যাপ্রোচের সূচনা ঘটল, যখন একদল বৈজ্ঞানিক নজরদার (scientific inspectors) পৃথিবী জুড়ে ল্যাবরেটরি থেকে ল্যাবরেটরিতে ঘুরে বেড়ানো শুরু করলেন।

> 'কিছু কিছু বিজ্ঞানীর আশঙ্কা বিজ্ঞানের এরকম 'নিয়ন্ত্রণ' (regulation) জালিয়াতি ধরার এক ধরনের সরকারি স্কোয়াড তৈরির পথ দেখাতে পারে যা হবে বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা ও মতামত আদান-প্রদানের পক্ষে দুর্ঘটনা।' লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের ইমিউনোলজির অধ্যাপক অ্যাভরিয়ন মিচিসন (Avrion Mitchison) বেনভেনিস্তের ব্যাপারটাকে 'অসচেতন তথ্য নির্বাচনের (unconscious data selection) প্রকৃষ্ট নমুনা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পুরো ঘটনায় কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর ভাষায়, 'যারা মনে করছেন, বিজ্ঞানের বিরাট জাহাজ এরকম ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাঁরা ভুল করছেন।'

৪ অগাস্ট ১৯৮৮, *নেচার* (পৃ. ৩৬৭, ৩৭২, ৩৭৫-৭৬) :

সম্পাদকীয় শিরোনাম : *When to publish pseudoscience.* সম্পাদকীয়তে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলা হয়েছে :

> যখন ফরাসি ডাক্তারদের চারভাগের একভাগ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন, তখন স্পষ্টতই এই বিতর্কের ইতি টানা বাড়াবাড়ি রকমের বিপজ্জনক। ল অফ মাস অ্যাকশন বাতিল হওয়ার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেও এই পত্রিকা এই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপারের দিকে খোলাচোখে তাকিয়ে থাকবে।
>
> কি প্রকাশ করা হবে না হবে সে বিষয়ে পুরোপুরি অ্যাকাডেমিক পত্রিকার বেলায় সহজ নিয়ম রয়েছে। কিন্তু (*নেচারের* মতো) পত্রিকা, যাদের কাজ কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট মৌলিক বিজ্ঞান (excellent original science) প্রকাশ করাই নয় বরং সাধারণ পাঠককুলকে ঠিকমতো অবহিত রাখাও (to keep a general readership well-informed), তাদের অবশ্যই অন্য মাছও ভাজতে হয়। কেবলমাত্র ঘটনার রিপোর্ট প্রকাশ করাই সবসময় যথেষ্ট নয়। তবে এই দুটো কাজই একে অন্যের পরিপূরক, কেননা, হায়, কে বলতে পারে যে উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানই (excellent science) বিজ্ঞানের সবটুকু ?

সংবাদ বিভাগের শিরোনাম : *ফরাসী সংবাদপত্রে বেনভেনিস্তে বিতর্ক জোর কদমে।*

খবরে প্রকাশ :

> বেনভেনিস্তের দাবি ফরাসী সংবাদপত্রে যে-রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, *নেচারের* নিজস্ব তদন্তের রিপোর্ট মোটেও তা থেকে কম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি। বেনভেনিস্তে ফরাসি সংবাদপত্রে সুপরিচিত। তাঁদের গবেষণাপত্রটি *নেচারে* প্রকাশিত হওয়ার আগেই (২৯-৩০ মে ১৯৮৮) একটি ফরাসি সংবাদপত্র বেনভেনিস্তের সাক্ষাৎকার ছাপে।

---

* চেশায়ার ক্যাট (Cheshier Cat) ১৮৬৫ সালে প্রথম প্রকাশিত লুই ক্যারলের অমর সৃষ্টি *আজব দেশে অ্যালিস* (*Alice in wonderland*) নামে ইংরেজী কল্পকাহিনীর চরিত্র একটি বেড়াল। বেড়ালটা উনুনের পাশে, বা গাছের ডালে বসে বসে দু'কান অব্দি ছড়ান হাসি হাসে এবং থেকে থেকে দেখা দেয় ও মিলিয়ে যায়। কখনও কখনও এর শরীরটা মিলিয়ে যায় কিন্তু হাসিটা বাতাসে ভাসতে থাকে। ছোট্ট মেয়ে অ্যালিস ভাবে 'আমি হাসি ছাড়া বেড়াল প্রায়ই দেখেছি। কিন্তু বেড়াল ছাড়া হাসি। জন্মে এমন অদ্ভুত জিনিস আর দেখি নি বাবা।'

গবেষণাপত্রটি *নেচারে* বেরোনোর পরপরই 'অবিশ্বাস্য সত্য' থেকে শুরু করে নানান উদ্ভট মনগড়া ধারণা খবরের কাগজে প্রকাশিত হতে থাকে। একটি পত্রিকা বেনভেনিস্তের দাবিকে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী লেন (Jean Marie Lehn)-এর অবিশ্বাস দিয়ে ব্যালান্স করলেও অন্য দুটি পত্রিকা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করেছে। *যুক্তিত্রাণে যাদু* (*magic to the rescue of reason*) শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এদের একটাতে *নেচারকে* আক্রমণ করে লেখা হয়েছে, 'এতদিন পর্যন্ত (*নেচার*) ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সমাদৃত (বিজ্ঞান পত্রিকাগুলোর) একটি'। একটি পত্রিকা মনে করে, 'বেনভেনিস্তের চেয়ে বোধহয় *নেচারই* হারালো বেশি।' ঐ পত্রিকায় ২৯ জুন ১৯৮৮তে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বেনভেনিস্তে বলেছেন 'আমার গবেষণা যাচাই করতে নেচার একজন ম্যাজিশিয়ান পাঠাল আর INSERM (যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বেনভেনিস্তে কাজ করেন) কর্তৃপক্ষ টু শব্দটি পর্যন্ত করল না। এরপর আর কোনো কথা বলা যায় না!'

একদিকে বৈজ্ঞানিক বিতর্ক চলছে অন্যদিকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কোম্পানি ল্যাবরেটরিস বোইরোন (Laboratories Boiron) (যারা বেনভেনিস্তের গবেষণার অর্থের একটা অংশ যুগিয়েছে) কিন্তু হোমিওপ্যাথির ব্যাপারে পুনরুজ্জীবিত আগ্রহ থেকে তাদের লাভ সুনিশ্চিত করতে সচেষ্ট। বোইরোন, যারা LHF নামে আরেকটা প্রধান হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানির একান্ন শতাংশ (৫১%) শেয়ারের মালিক, গত সপ্তাহে বাকি শেয়ারগুলোও কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চিঠিপত্রের শিরোনাম : *কেবল হাসিটুকু রয়ে গেছে (Only the smile is left)*।

বেথেস্ডা (USA)-র ন্যাশনাল ইন্স্টিটিউটস্ অফ হেলথ-এর হেনরি মেৎজার ও স্টিফেন সি. ড্রেসকিন একই ধরনের পরীক্ষা মানুষের বেসোফিলের বদলে ইঁদুরের বেসোফিলিক লিউকিমিয়া সেল-এ চালিয়ে বেনভেনিস্তের মতো ফলাফল পান নি। তাঁদের সিদ্ধান্ত :

বেনভেনিস্তের পরীক্ষা 'এমনকি প্রায় একই রকম সিস্টেমেও খাটছে না।' তাঁরা বেনভেনিস্তের ব্যাপারটাকে Cheshire cat* -এর গল্পের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য : 'আমাদের একজন (H.M.) ১৯৮৭-এর এপ্রিলে নেচারের অনুরোধে বেনভেনিস্তের প্রবন্ধ বিচার করে মন্তব্য করেছিলেন, এই পর্যবেক্ষণ *নেচারের* সম্পাদকের বাছাই করা এক বা একাধিক ল্যাবরেটরিতে যাচাই করা দরকার। তা না করে, ল্যাবরেটরি বাছাইয়ের কাজটা করলেন বেনভেনিস্তে আর *নেচার* আগে রিপোর্ট ছাপাল, তারপর তড়িঘড়ি সম্পাদক, একজন ম্যাজিশিয়ান ও একজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে তৈরি এমন একটা অনুসন্ধানী দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল, যার কোনো সদস্যেরই প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে গবেষণার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাদের রিপোর্ট প্রকাশিত দাবির সমর্থন যোগায় নি বটে, তবে সিরিয়াস বিজ্ঞানীদের আতঙ্কিত করেছে : মূল গবেষণাপত্রটি প্রকাশের ফলে যে হাস্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল : ('উদ্যোগী হোমিওপ্যাথরা উল্লসিত।। ওদিকে বিজ্ঞানীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়...' (*নিউ সাইন্টি*), 'হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ভিত্তির খোঁজ মিলেছে' (নিউজ উইক ২৫ জুলাই ১৯৮৮), এটা তাতে আরো হাসির খোরাক যোগাল।

> আমরা মনে করি, এ-ব্যাপারে *নেচার* যে অ্যাপ্রোচ বেছে নিয়েছে, তার জন্য নেচারের দুঃখপ্রকাশ করা উচিত।... যখন নতুন তথ্যের সাথে পুরনো, সুপ্রমাণিত, সহজেই-পুনারাবৃত্তি-ঘটানো-যায় এমন তথ্যের তীব্র বিরোধ বাধে, তখন অন্যরকম সম্পাদকীয় মানের দরকার...এটা সত্যিই লজ্জার ব্যাপার। আমাদের চায়ে মিষ্টি স্বাদ আনতে এখনও কিন্তু পুরো একচামচ চিনিই লাগে।

লন্ডনের রয়াল ফ্রি হসপিটালের পি. এম. গাইলার্দে (P. M. Gaylardc) বেনভেনিস্তের পর্যবেক্ষণের তথ্যকে বানানো বা synthetie বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আমেরিকার ইলিনয়স বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেথ এস. সাসলিক(Kenneth S. Suslick)-এর বক্তব্য বেনভেনিস্তের মূল আসামীরা হলো ঝাঁকানোর সময় তৈরি হওয়া OH., H., H_2O, HO_2 এসব, যা কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এটাই artifact।
আমেরিকার বায়োনিক্স কর্পোরেশনের জে. লেসলী ফ্লিক-এর বক্তব্য :

> বেনভেনিস্তের বিবরণ থেকে মনে হয় দ্রবণে সব সময়ই হেপারিন ছিল। হেপারিন থাকার জন্যই ওরকম অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেছে।

ফ্রান্সের একটি ক্যানসার গবেষণাকেন্দ্র থেকে এম. জে. এসক্রিবানো (M. J. Escribano) মনে করেন :

> যে দ্রবণে বেসোফিল রাখা হচ্ছিল তার কোনো কোনো উপাদানের সঙ্গে (যেমন হেপারি বা EDTA) অ্যান্টি IgE ছাড়া অন্য কোনো দানামুক্তিকারী (degranulating) অণু লেগে ছিল। ফলে সক্রিয় অণুর প্রকৃত ডাইলুশন হচ্ছিল না।

১৮ অগাস্ট ১৯৮৮ *নেচার* (পৃ. ৫৫৯)

চিঠিপত্রের শিরোনাম : *পুনরাবৃত্তি না ঘটার সাক্ষ্য*
আমেরিকার সেল প্যাথোলজি ল্যাবরেটরির জ্যাঁ-ক্লেয়ার সীগ্রেভ (Jean Clare Seagrace) অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়ার অন্য একটা মডেলে (ইঁদুরের must cell tumour line) একই ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে বেনভেনিস্তের মতো ফলাফল পান নি। তিনি বেনভেনিস্তের ফলাফলের ব্যাখ্যা হিসেবে artifactকে দায়ী করেছেন।

ইতালির আন্দ্রিয়া সেসালপিনো ফাউন্ডেশনের বোনিনি, আদ্রিয়ানিও বালসানো একই ধরনের পরীক্ষা চালিয়েছিলেন মানুষের বেসোফিল নিয়েই। তবে হিস্টামিন বেরুনোর পরিমাণটা তাঁরা মেপেছেন অন্য পদ্ধতিতে। বেনভেনিস্তের মতো ফল কিন্তু তাঁরা পান নি। চিঠির উপসংহারে তাঁরা জানিয়েছেন :

> বেনভেনিস্তের পর্যবেক্ষণ 'অন্য টেকনিকের বেলায় খাটছে না। আমরা কি আন্দাজ (speculate) করব কেন জল কেবল কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস মনে রাখতে পারে অথচ অন্যত্র তা ভুলে যায়?' রহস্য করে তাঁরা বলেছেন, আরো অনেকটা জল না গড়ালে জলের অণুর এই পক্ষপাতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

১৮ অগাস্ট ১৯৮৮, *নিউ সাইন্টিস্ট* (পৃ. ১৯)।

সম্পাদকীয়র শিরোনাম : *Inhuman Nature*

এই তীব্র আক্রমণাত্মক সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন তোলা হয়েছে :

> কেন যে একটা খ্যাতিমান পত্রিকা এমন গবেষণাপত্র (paper) প্রকাশ করে যা তারা বিশ্বাসই করে না?
>
> *নেচার* আত্মপক্ষ সমর্থন করে সম্পাদকীয়তে লিখেছে, 'এরকম একটা সাধারণ পত্রিকা (general journal), যাদের কাজ কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট মৌলিক বিজ্ঞান প্রকাশ করাই নয় বরং সাধারণ পাঠককুলকে ঠিকমতো অবহিত রাখাও, তাদের অবশ্যই অন্য মাছও ভাজতে হয়।' আর এখানেই রয়েছে উত্তরটা। 'সাধারণ পাঠককুল'কে পেতে হলে আপনার দরকার প্রচার (publicity)। এই কাহিনীর আসল মতলবটা কি তবে প্রচার? নিঃসন্দেহে, *নেচারের* আচরণের সমালোচনা করে যেসব চিঠি দপ্তরে এসেছে তাদের অতি সামান্য অংশের বেশি ছাপানোর কোনো লক্ষণই নেচার দেখাচ্ছে না। এ পর্যন্ত *নেচারের* আচরণকেন্দ্রিক চিঠিগুলোর তুলনায় বিজ্ঞানকেন্দ্রিক চিঠিগুলোই মূলত ছাপা হয়েছে।...আমরা আশা করব, জাক্স বেনভেনিস্তের ব্যাপারটা ছিল একটা বিচ্যুতি (aberration) এবং ভবিষ্যতে পত্রিকার প্রচারের স্বার্থে বিজ্ঞানীদের অপব্যবহৃত হওয়ার ঝুঁকি আর থাকবে না।

পুনশ্চ

এতক্ষণ পড়ে বুঝতেই পারছেন, *নেচার* ও *নিউ সাইন্টিস্ট* পত্রিকার পাতায় বেনভেনিস্তে বিতর্কের অন্তত একটা পর্যায় শেষ হয়েছে গত অগাস্টের মাঝামাঝি নাগাদ। এদিকে *দেশ* পত্রিকার ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ 'হোমিওপ্যাথির সপক্ষে' (লেখক : সমরজিৎ কর)। *নেচারে* বেনভেনিস্তেদের গবেষণাপত্র বেরোনো এবং তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াই কেবলমাত্র প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে। অথচ তারপর জল অনেকদূর গড়িয়েছে। *নেচারের* পর্যবেক্ষক দলের রিপোর্টে বেনভেনিস্তের দাবির সমর্থন মেলে নি (দ্রষ্টব্য : *Nature*, ৩৩৪, ২৮ জুলাই ১৯৮৮, পৃ. ২৮৭-২৯১)। একাধিক বিজ্ঞানী একই ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে প্রত্যাশিত ফলাফল পান নি (পৃ. ৫৫৯)। বেনভেনিস্তেদের ফলাফল প্রকাশের পরে কোনো গবেষক তাঁদের মতো ফল পাচ্ছেন এমন দাবি করেন নি। অথচ এসব খবর *দেশ* পত্রিকায় এখনও চোখে পড়ে নি। এদেশের কিছু খবরের কাগজেও বেনভেনিস্তের রিপোর্টের খবর গুরুত্বসহকারে ছাপা হয়। কিন্তু পরের খবরগুলো আর স্থান পায় নি। এগুলো দায়িত্বহীন ও অবৈজ্ঞানিক **বিজ্ঞান** সাংবাদিকতারই নমুনা।

যতদিন না পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে আলাদা আলাদা বহু গবেষকদল ঐ ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে বার বার বেনভেনিস্তের মতো ফলাফল পাচ্ছেন এবং তা যে কোনো arti-fact-এর জন্যে নয় তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে ততদিন হোমিওপ্যাথির তাত্ত্বিক ভিত্তিক (অর্থাৎ অণুর অস্তিত্ব না থাকলেও তার কার্যকারিতা থাকতে পারে), বিশ্বাস করার কোনো কারণ ঘটছে না।

ল্যানসেট পত্রিকার পুরনো সংখ্যায় একদল বিজ্ঞানীর একটি গবেষণাপত্রে [Reilly. D. T. et al. *Lancet* ii, ৮৮১-৮৮৬ (১৮৬০) একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, যাতে মূল 'ওষুধে'র কোনো অণুই থাকবার কথা নয়, তা নিয়ে 'ডাবল ব্লাইন্ড কনট্রোল্ড' পরীক্ষা চালিয়ে ওসুধের কার্যকারিতা পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়েছে।

ল্যানসেটের গবেষণাপত্রটি প্রসঙ্গে ভিটামিন-সি ও সর্দির কথা মনে পড়ছে। ভিটামিন-সি সর্দি সারানোর ওষুধ কিনা সে-কথা জানার জন্যে বহু ডাবল ব্লাইন্ড কনট্রোল্ড পরীক্ষা চালানো হয়েছে। দু-একটাতে সর্দি সারাতে ভিটামিন-সির কার্যকারিতা (efficacy) আছে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও বেশির ভাগ পরীক্ষাতেই সর্দি আর ভিটামিন-সির কোনো সম্পর্ক পাওয়া যায় নি (*Goodman and Gillman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮৫, Mcmillan, N.Y)।

১৯৬০-এ প্রথম ভিটামিন-সি ও সর্দির সম্পর্কের দাবি করা হয়। এটা ১৯৮৮। এই আটাশ বছরে বহু ডাবল ব্লাইন্ড কনট্রোল্ড পরীক্ষা করা সত্ত্বেও ভিটামিন-সি সর্দিতে ওষুধের কাজ করে কিনা সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। তাই বলছি, একটামাত্র ডাবল ব্লাইন্ড কনট্রোল্ড পরীক্ষার ফলাফল থেকেই একথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটা ঘটনা।

যে-সব কথাবার্তা হলো, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের তত্ত্ব এবং কার্যকারিতা (efficacy)–এদের কোনোটাই আজ অবধি বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। 'হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কাজ করে' বহুসংখ্যক মানুষের এই অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসকে উড়িয়ে না দিয়ে আমরা মনে করি হোমিওপ্যাথি সত্যিই কাজ করে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা ব্যাপকভাবে চালানো উচিত। হোমিওপ্যাথির ভেতর যদি গ্রহণযোগ্য উপাদান থাকে, তাহলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাকে সনাক্ত করে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আওতায় আনার প্রক্রিয়াকে যদি ত্বরান্বিত করা যায় ততই মঙ্গল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
প্রভাত মণ্ডল, শুভাশিস মাইতি, এম. কে. চট্টোপাধ্যায় (সি সি এম বি, হায়দরাবাদ)।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর ১৯৮৮

হোমিও বিতর্ক ও তারপর : বেনভেনিস্তে বরখাস্ত

ফরাসী বিজ্ঞানী জাকস বেনভেনিস্তেকে (Jacques Benveniste) মনে আছে নিশ্চয়ই। ইনি ১৯৮৮-তে 'জলের স্মৃতিশক্তি'র খোঁজ পাওয়ার দাবি করে বিজ্ঞানীমহলে রীতিমতো ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন। বেনভেনিস্তে ও তাঁর সহযোগীরা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এমন ফলাফল পাচ্ছিলেন বলে দাবি করেছিলেন, যার অর্থ হলো : একটি দ্রবণে একটি কার্যকর পদার্থের অণুর অস্তিত্ব না থাকলেও পদার্থটির কার্যকারিতা বজায় থাকতে পারে। বেনভেনিস্তেরা যা দাবি করেছিলেন, তা সত্যি হলে এতদিন-ধরে-চলে আসা এবং অসংখ্যবার অসংখ্যভাবে পরীক্ষিত অনেকগুলো গোড়াকার ধারণা পুরোপুরি বাতিল করতে বা বদলাতে হবে। তাছাড়া, এটি সঠিক হলে 'হোমিওপ্যাথি' নামের বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার তত্ত্ব এবং চর্চা একটা পরীক্ষাগত ভিত্তি খুঁজে পাবে। স্বভাবতই, বিষয়টিকে ঘিরে সে-সময় তীব্র উত্তেজনা ও বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকায়।

বেনভেনিস্তে ফ্রান্স সরকারের চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণাকেন্দ্র INSERM-এ কাজ করতেন। ১৯৮৯-এর এপ্রিলে ঐ ল্যাবরেটরির বিভিন্ন কাজকর্মের নিয়মমাফিক মূল্যায়নের (routine evaluation) সময় মূল্যায়নকারীরা বলেন, বেনভেনিস্তে 'INSERM-এর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন' এবং তাঁরা বেনভেনিস্তেকে তাঁর পদ থেকে সাময়িকভাবে (যতদিন না তিনি নতুন কোনো গবেষণার পরিকল্পনা পেশ করেন) বরখাস্ত করার সুপারিশ করেন। অবশ্য এরমধ্যে তাঁকে অতিলঘু দ্রবণের কার্যকারিতা সংক্রান্ত কাজকর্ম এবং এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলিতে কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখতে হবে।

বরখাস্ত হওয়ার পর জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে বেনভেনিস্তে সাংবাদিকদের বলেছেন যে, তিনি ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণাসংস্থা INSERM-এর 'ইনকুইজিশনে'র (inquisition) শিকার হয়েছেন।

এ-পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন আলোচনা থেকে মনে হয়, সত্যিই বেনভেনিস্তেদের গবেষণায় গলদ ছিল। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার প্রশাসনিক 'মূল্যায়ন' বা শাস্তি বিজ্ঞানের বিতর্কের ক্ষেত্রে যত কম প্রযুক্ত হয় ততই মঙ্গল।

সূত্র :

'Gail Vines, Benveniste suspended for damaging Institute's Image,' *New Scientist*, ১৫ জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ৩০

সুদীপ্ত সরস্বতী

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, ১৯৯০

হোমিওপ্যাথি বিতর্ক : একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে

সুদীপ্ত সরস্বতী

বার বার ডাইলিউট বা লঘু করার ফলে যে-জলে ওষুধের কোনো অণুই অবশিষ্ট নেই, সেই জলে ওষুধের কার্যকারিতা বজায় থাকতে পারে — এধারণা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এটা কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। ১৯৮৮-তে বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা "নেচার"-এ ফরাসী বিজ্ঞানী জাকস বেনভেনিস্তে এবং তাঁর সহকর্মীরা এক গবেষণাপত্রে দাবি করেন, অতিলঘু জলীয় দ্রবণে একধরনের অ্যান্টিবডির একটি অণু অবশিষ্ট না থাকলেও অ্যান্টিবডির ক্রিয়াশীলতা কিন্তু দিব্যি বজায় থাকে। এই গবেষণাপত্র প্রকাশের পর বিজ্ঞানীমহলে বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। (আগের তিনটি লেখায় তা আলোচিত হয়েছে।) ঝড় থেমে গেলেও সেই বিতর্কের জের কিন্তু এখনও চলছে।

জলের "স্মৃতিশক্তি" নিয়ে জলঘোলা

কিভাবে কার্যকরী পদার্থের অণুবিহীন দ্রবণে ঐ অণুর কার্যকারিতা বজায় থাকতে পারে, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বেনভেনিস্তে এক অভিনব আন্দাজের (speculation) অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে, জলে কার্যকরী অণুর অস্তিত্ব না থাকলেও অণুর "স্মৃতি" ("memory") কিন্তু থেকে যায়। প্রশ্ন হলো, অতীতে দ্রবীভূত কোনো পদার্থের অণুর স্মৃতি জল কিভাবে ধরে রাখতে পারে? এবিষয়ে জলের স্মৃতিশক্তির প্রবক্তাদের আন্দাজনির্ভর ব্যাখ্যা (speculation) হলো, স্মৃতি থেকে যায় জলের অণুর "সুশৃঙ্খল বিন্যাস" বা "সুবিন্যস্ত গঠন" ("organized structure" বা "ordered structure" বা "structural order") হিসেবে।

পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট পার্কের (Robert Park) মতে, এই আন্দাজের প্রধান দুর্বলতা হলো, এতে থার্মাল এনার্জি বা তাপশক্তিকে ধর্তব্যের মধ্যে না আনা। এটা ঠিকই যে জলের অণুদের মধ্যে নিজেদের সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে নেওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে। এই প্রবণতা খুব ভালোভাবে ধরা পড়ে যখন জলের উষ্ণতা হিমাঙ্কের (freezing point) নিচে নেমে যায়। তখন বরফের স্ফটিক (crystal) তৈরি হয়, যাতে অণুগুলো সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করে। কিন্তু হিমাঙ্কের ওপরের উষ্ণতায় জলের একটা অণুর সঙ্গে আরেকটা অণুর জুড়ে থাকার জন্যে দরকারি দুর্বল বন্ধন (weak bonds) খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ভেঙে যায় অণুর গতির জন্যে — যার মূলে রয়েছে থার্মাল এনার্জি বা তাপশক্তি (যা ব্রাউনিয়ান গতির জন্যে দায়ী)। জলের ভেতর ছোটো ছোটো সুশৃঙ্খল এলাকা সবসময়ই তৈরি হচ্ছে, আবার পরমুহূর্তে ভেঙেও যাচ্ছে। জলের অণুদের স্বভাবচরিত্র সংক্রান্ত এই প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ধারণায় হোমিওপ্যাথিক ওষুধের অণুর স্মৃতি জলের অণুর সুশৃঙ্খল বিন্যাস হিসেবে ধরে রাখার অবকাশ নেই।

জলের স্মৃতিশক্তির ধারণা আরো বেশ কিছু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বহু হোমিওপ্যাথিক ওষুধই বড়ি বা গ্লোবিউল হিসেবে বিক্রি হয়। এই গ্লোবিউল হোলো ওষুধের অতিলঘু দ্রবণ-সমৃদ্ধ ল্যাকটোজের বড়ি। যে তরলে হোমিওপ্যাথিক ওষুধকে লঘু করা হয়, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জল ও অ্যালকোহলের একটি মিশ্রণ। এই তরল একসময় ল্যাকটোজের বড়ি থেকে উবে যায়। প্রশ্ন হলো, ওষুধের অণুর যে স্মৃতি জল ধরে রেখেছিল, জল উবে যাওয়ার সময় জল থেকে কি তা ল্যাকটোজে স্থানান্তরিত হয়? জল যেভাবে ওষুধের স্মৃতি বহন করে, ল্যাকটোজও কি একইভাবে তা "মনে রাখে"? ল্যাকটোজের বড়ি খাওয়ার পর তা থেকে ওষুধের অণুর স্মৃতির বার্তা কিভাবে রোগীর দেহকোষে গিয়ে পৌঁছয়? শুধু ল্যাকটোজের বড়িই নয়, আমেরিকায় সিগঅ্যারেস্ট (CigArrest) নামে একটি চিউয়িং গাম (chewing gum) ধূমপানের আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার হোমিওপ্যাথিক ওষুধ হিসেবে বিক্রি হয়। চিউয়িং গামও কি জলের মতো ওষুধের অণুর স্মৃতিকে ধরে রাখতে পারে? এছাড়া, কিভাবে প্রমাণ করা সম্ভব যে অতিলঘু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সত্যিই হোমিওপ্যাথিক ওষুধ — নিছক জল নয়? কোন্ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গায়ে লেখা তথ্যের (লেবেলের) সত্যতা যাচাই করে দেখা সম্ভব? হোমিওপ্যাথিক ওষুধের স্মৃতিবাহী জল এবং ওষুধের স্মৃতিমুক্ত জলের তফাত ধরতে পারা যাবে কোন্ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দিয়ে?

জলের "স্মৃতিশক্তি" থেকে ডিজিটাল বায়োলজি : বেনভেনিস্তের একলা চলা

হোমিওপ্যাথির সপক্ষে বেনভেনিস্তের দাবি নিয়ে অনেক জলঘোলা হওয়ার পর ফরাসী সরকার তাঁকে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে দরকারি অর্থসাহায্য দেওয়া (research funding) বন্ধ করে দেয়। ফরাসী সরকারের এই আচরণের অনেকেই সমালোচনা করেছেন। সমালোচকেরা একে "বৈজ্ঞানিক ডাইনিপোড়ানো" ("scientific witchhunt") "বিজ্ঞানে সেন্সরশিপ" ("censorship in science"), "সরকারি বিজ্ঞানীদের লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করার অপরাধে একঘরে করা", এসব নানা অভিধায় অভিহিত করেছেন। বেনভেনিস্তের সমর্থনে ইংরেজিতে একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে বেস্ট সেলার হলো "The Memory of Water : Homoeopathy and the Battle of Ideas in the New Science"। ১৯৯৫-এ প্রকাশিত এই বইটি (এখন পাওয়া যায় না) লিখেছেন মিশেল শিফ (Michel Schiff), যিনি একসময় বেনভেনিস্তের সঙ্গে গবেষণা করেছেন।

ফরাসী সরকারের টাকা বন্ধ করে দেওয়া কিন্তু বেনভেনিস্তের গবেষণা থামিয়ে দিতে পারেনি। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের টাকায় সীমিত সংখ্যক গবেষকদল নিয়ে বেনভেনিস্তে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর পুরনো দাবি থেকে সরে তো আসেনই নি, বরং আরেক প্রস্থ চমকপ্রদ দাবি নিয়ে হাজির হয়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিক দাবি, জল সক্রিয় অণুর ক্রিয়াশীলতার স্মৃতি যে ইনফরমেশনের আকারে ধরে রাখে, সেই ইনফরমেশনকে বিশেষ ধরনের অ্যাম্প্লিফায়ার এবং তড়িৎ-চুম্বক কয়েলের সাহায্যে পাকড়াও (capture) করে, কমপিউটারে রেকর্ড করে, ই-মেলের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে পাঠিয়ে দিয়ে, সেই রেকর্ড বাজিয়ে ("playback" বা "replay" করে) নিষ্ক্রিয় জলকে সক্রিয় (activate) করে তোলা সম্ভব। না, ঠাট্টা নয়। ছাপার ভুলও নয়। বেনভেনিস্তে এমনটাই দাবি করেছেন।

বিশ্বাস না হলে বেনভেনিস্তের ওয়েবসাইটhttp ://www.digibio.com দেখুন। তাঁর বক্তব্য, এই দাবির সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের এক নতুন শাখার গোড়াপত্তন করেছেন যার নাম ডিজিটাল বায়োলজি। বেনভেনিস্তের এই সাম্প্রতিক দাবি আপনার বা আমার কাছে হাসির খোরাক বলে মনে হতে পারে। তবে সবার কিন্তু এতে হাসি পাচ্ছে না। কিছু কিছু ব্যক্তি এটাকে রীতিমতো সিরিয়াসলি নিয়েছেন। বেনভেনিস্তে একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় গবেষণাপত্রের আকারে তাঁর সাম্প্রতিক দাবি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন [Activation of human neutrophils by electronically transmitted phorbol-myristate acetate. Medical Hypotheses (2000) 54 (1) : 33-39]।

ওয়েইন জোনাস (Wayne Jonas) আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অফ হেলথের (NIH) অফিস অফ অলটারনেটিভ মেডিসিনের ডিরেক্টর থাকার সময় বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা "নেচার মেডিসিন"-এ (১৯৭৭) বেনভেনিস্তের দাবি প্রসঙ্গে লিখেছেন যে তা "আধুনিক জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের গভীরতম এবং জটিলতম ধাঁধাগুলোর একটা। সুনির্দিষ্ট নন-মলিকিউলার ইনফরমেশনকে জলের ভেতর ধরে রাখা কিংবা ইলেকট্রনিক উপায়ে তারের মাধ্যমে তা একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠানো কি সত্যিই সম্ভব, যা কি না হোমিওপ্যাথিতে দাবি করা হচ্ছে? আপাতদৃষ্টিতে এই ধারণা যুক্তিগ্রাহ্য না মনে হলেও জীবদেহের এবং জীবকোষের ভেতরকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে (basic biological and cellular communications) বুঝে ওঠার ব্যাপারে এর মধ্যে কিন্তু প্রভূত তাৎপর্য লুকিয়ে আছে।"

নভেম্বর ২০০২ : বিজ্ঞানের অগ্নিপরীক্ষায় জলের "স্মৃতিশক্তি"

বেশ কিছু বিজ্ঞানী জলের "স্মৃতিশক্তি" সংক্রান্ত পরীক্ষা ক'রে দেখতে গিয়ে বেনভেনিস্তের মতো ফলাফল পাননি। অর্থাৎ পুনরাবৃত্তির পরীক্ষায় বেনভেনিস্তের দাবি উতরোতে পারেনি। ২০০০ সাল পর্যন্ত এটাই ছিল চিত্র। কিন্তু ২০০১ সালে বেলফাস্টের কুইনস ইউনিভার্সিটির (Queen's University, Belfast) ম্যাডেলিন এনিস (Madeleine Ennis) দাবি করলেন যে, হিস্টামিনের (Histamine) অণুকে ক্রমাগত লঘু করতে করতে যখন লঘু দ্রবণে হিস্টামিনের কোনো অণুই আর পড়ে থাকে না, তখনও কিন্তু দ্রবণে হিস্টামিনের কার্যকারিতা বজায় থাকে। এই অ-সাধারণ দাবি পুনরাবৃত্তির পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়া বেনভেনিস্তের একই ধরনের দাবিসংক্রান্ত বিতর্ককে আবার জিইয়ে তুলল।

এই বিতর্কে কোন্ পক্ষ ঠিক আর কোন্ পক্ষ ভুল তা নির্ধারণ করার জন্যে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এলো বিবিসির বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান হরাইজন (Horizon)। ২০০২-এর নভেম্বরে এনিসের পরীক্ষা চালানোর ব্যাপারে বিবিসিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন রয়্যাল সোসাইটি, রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন এবং গাইজ (Guy's) হসপিটালের বিজ্ঞানীরা। এই পরীক্ষার কাণ্ডকারখানা দেখতে আমেরিকা থেকে লন্ডনে এসে হাজির হন জেমস র‍্যান্ডি (James Randi)। অপবিজ্ঞানবিরোধী আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী র‍্যান্ডি অনেকদিন আগেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, কেউ যদি প্রমাণ করতে পারেন যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সত্যিই রোগ সারাতে পারে অথবা জলের "স্মৃতিশক্তি"র যে দাবি

বেনভেনিস্তে করেছেন তা ঠিক, তাহলে র‍্যান্ডির ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে তাঁকে এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। যদিও হোমিওপ্যাথির সমর্থকেরা ব'লে থাকেন যে, হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতার পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ (evidence) দাখিল করা সম্ভব, তাঁদের কেউই কিন্তু আজ অবধি হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতার প্রমাণ দিয়ে মিলিয়ন ডলারের এই পুরস্কার গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেননি। বিবিসি আয়োজিত এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় হিস্টামিনের অণুবিহীন অতিলঘু দ্রবণে হিস্টামিনের কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া গেলে পরীক্ষকেরা এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার পাবেন র‍্যান্ডির কাছ থেকে। তাই পরীক্ষার মঞ্চে র‍্যান্ডি হাজির।

র‍্যান্ডির নজরদারিতে কড়া সতর্কতা নেওয়া হল যাতে পরীক্ষকদের কেউই আগাম জানতে না পারেন যে তিনি হোমিওপ্যাথিক দ্রবণের ক্রিয়াশীলতা পরীক্ষা করছেন, না কি বিশুদ্ধ জলের। পরীক্ষা একেবারে শেষ হওয়ার পরে ফাঁস করা হল কোন্‌টা কিসের স্যাম্পল। দেখা গেল, পুনরাবৃত্তির পরীক্ষায় **এনিসের দাবি উত্তীর্ণ হতে পারল না**। এক মিলিয়ন ডলার র‍্যান্ডির ফাউন্ডেশনের কাছেই রয়ে গেল।

জলের ''স্মৃতিশক্তি''-র বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া গেলে তা হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবে। অতীতে গুলে থাকা ওষুধের অণুকে জল ''স্মৃতি' হিসেবে ধরে রাখতে পারে — এটা একটা extraordinary claim বা অ-সাধারণ দাবি। এই অ-সাধারণ দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চাই অ-সাধারণ সাক্ষ্যপ্রমাণ (''Extraordinary claims demand extraordinary evidence'')। এটা ঠিকই যে বিবিসির একটা পুনরাবৃত্তির পরীক্ষার ফলাফলই শেষকথা নয়। কিন্তু এই পরীক্ষার ফলাফলে আমরা আবারও দেখলাম, জলের ''স্মৃতিশক্তি''-র সপক্ষে অ-সাধারণ সাক্ষ্য প্রমাণ (extraordinary evidence) পাওয়া তো দূরের কথা, আজ অবধি পুনরাবৃত্তির কোনো সাধারণ পরীক্ষাতেও জলের ''স্মৃতিশক্তি''-র দাবি উত্তীর্ণ হতে পারছে না। যতদিন তা না পারছে, ততদিন জলের ''স্মৃতিশক্তি''-র দাবি অবৈজ্ঞানিক-ই রয়ে যাবে।

প্রসঙ্গ হোমিওপ্যাথি : পত্রিকা-পরিচিতি

হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণাপত্র প্রকাশ এবং তাকে ঘিরে তর্কবিতর্কে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল আলোড়িত। এই আলোড়ন সম্ভব হয়েছে কারণ, *নেচার*, *নিউ সাইন্টিস্ট*, *সায়েন্স* ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় এসব প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছে। স্বভাবতই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

নেচার

ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক। সূচনাকাল ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে দেশ-বিদেশের সংবাদ, তথ্য, ভাষ্য, বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণ ও আলোচনা ছাড়াও এতে গবেষণামূলক ছোটো রচনাও ছাপা হয়। বিশেষত যে গবেষণার তাৎপর্য মৌলিক বলে বিবেচিত হয়। কাজেই বিভাগের গণ্ডী পেরিয়ে সমস্ত রকমের বিজ্ঞানীদের কাছেই পত্রিকাটির গুরুত্ব। তাছাড়া রাষ্ট্রনেতা, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞান প্রকাশক ইত্যাদি অ-বিজ্ঞানী মানুষদের কাছেও *নেচার* সমাদৃত। প্রাচীনত্বে, গুণমানে ও জনপ্রিয়তায় রীতিমতো কৌলিন্য অর্জন করেছে বলা যায়।

নিউ সাইন্টিস্ট

ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক। বিজ্ঞান বিষয়ে তথ্য, সংবাদ, আলোচনা এবং বিজ্ঞানের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণই প্রধান উপজীব্য। গবেষণাপত্র প্রকাশ করে না। বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন, ১৯৫৬তে সূত্রপাত।

ব্রিটেনের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল—কনজারভেটিভ ও লেবারের মতোই বিজ্ঞানভাষ্যে *নেচার* ও *নিউ সাইন্টিস্ট*-এর মেজাজে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

সায়েন্স

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত মাসিক। বিষয়বস্তু ও বিন্যাসে *নেচারের* ছাপ বহন করে। গবেষণাপত্রও প্রকাশিত হয়—মৌলিক তাৎপর্যযুক্ত—বিজ্ঞানের সব শাখার গবেষণা, পরিচিতির গণ্ডী যথেষ্ট হলেও নেচারের মতো কৌলিন্য অর্জন করে নি।

বলা বাহুল্য এগুলি সবই ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত।

Click Here
For More Books

উৎস মানুষ আগাগোড়াই ব্যাপক
মানুষের বিশ্বাস আর বিভ্রমের
রসায়নটাকে বুঝতে চেয়েছে, মর্যাদা দিতে
চেয়েছে মানুষের দ্বান্দ্বিক চিন্তার
উপকরণগুলিকে।
এই পরিপ্রেক্ষিতেই, হোমিওপ্যাথি ও
বিজ্ঞানের মুখোমুখি বিরোধিতার প্রশ্নে
একটি নির্ভরযোগ্য নির্ভেজাল তাত্ত্বিক
মীমাংসার অন্বেষণ উৎস মানুষ করতে
চেয়েছে অনেকদিন ধরেই। যার ফসল
বর্তমান এই গ্রন্থ।

ISBN 81 86371-24-9